প্রকাশক ঃ
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭-বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৫৭

মুদ্রক ঃ
শ্রীকিঙ্কর কুমার নায়ক
নায়ক প্রিণ্টার্স
৮১/১-ই, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

দীপালিকে—



জাতীয় প্রাণী

॥ এক ॥

বনে যারা থাকে, তাদের আমরা বলি বন্য। বন্যদের মধ্যে আছে নানা ধরনের পশু ও পাখি, বৈচিত্র্যে যারা অনন্য। তারা যে শুধু বনের শোভা বাড়ায় তা নয়, লোকালয়ের মানুষদেরও উপকার করে, তাদের জীবনকেও করে তোলে আনন্দময়।

বন্য পর্যায়ের অনেক প্রাণীকেই আমরা হিংস্র বলে মনে করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা আমাদের নিজেদের কাছেই জিজ্ঞেস করা উচিত। বাঘ, ভালুক, সিংহ, বুনো হাতি, শুয়োর প্রভৃতি, যাদের আমরা হিংস্র প্রাণী বলে মনে করি, তাদের মধ্যে অকারণ হিংস্রতা আমরা কতটুকু দেখতে পাই? কদাচিৎ নয় কি? সাধারণতঃ ক্ষুধা বা আত্মরক্ষার তাগিদেই তো তাদের হননের কাজে নামতে দেখা যায়। মানুষখেকো বাঘ বা চিতাবাঘের মানুষের ওপর আক্রোশ কি অকারণ? বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শিকারীদের হাতে আহত হয়েই তো তারা মানুষখেকো হয়ে ওঠে। অনেক সময় অবশ্য বৃদ্ধ বা অথর্ব হওয়ার দরুন হরিণ, সম্বর, বুনো শুয়োর প্রভৃতি দ্রুতগামী প্রাণীকে কাবু করবার ক্ষমতা তাদের থাকে না, অথবা এমনও হয় যে মানুষই তাদের খাদ্য-ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটিয়েছে, তাদের ভক্ষ্য প্রাণীদের মেরে নির্মূল করে ছেড়েছে, তখনই তারা শুধু পেটের জ্বালায় লোকালয়ের কাছাকাছি এসে মানুষের ওপরে হামলা করতে শুরু করে।

তাই আমাদের মনে রাখা দরকার যে, অকারণ হিংস্রতা বন্য পশুদের নেই, তা পুরোপুরি বর্তমান মানুষের মধ্যেই। শিকারের নেশা মানুষের এই অকারণ হত্যাস্পৃহার সবচেয়ে বড় একটি উদাহরণ। বন্য পশুদের দিক থেকে দেখলে, এবং তা আজ দেখা একান্ত প্রয়োজনও বটে, দেখা যাবে, তাদের চোখে মানুষই বোধহয় হিংস্রতম জীব। নিছক হত্যায় স্পৃহা মেটাবার জন্য পশুহত্যা মানুষ ছাড়া আর কেউই করে না।

শিকারীদের শিকারের নেশা বনের পশুপাখিদের মধ্যে চিরকালই সন্ত্রাস সৃষ্টি করে আসছে। তাদের বেপরোয়া হত্যালীলার ফলে বনের পশুপাখিদের সংখ্যা আজ কমে আসছে অভাবনীয় হারে। কিছু কিছু প্রাণী একেবারেই নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে।

উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দেশের সিংহ ও গণ্ডারের কথা বলা যায়। গুজরাটের গিরনরের স্যাংচুয়ারি বা অভয়ারণ্য ছাড়া আর কোথাও সিংহ দেখা যায় না। তেমনি জলদাপাড়া ও কাজিরাঙ্গার অভয়ারণ্যের গণ্ডির মধ্যে মাত্র কয়েকটি গণ্ডার

তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। পঞ্চাশ বছর আগে যে বাঘ সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মত ছিল, তার সংখ্যা এখন প্রায় মাত্র তিন হাজারের এসে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য বন্য প্রাণীদের অবস্থাও প্রায় অনুরূপ।

সুতরাং বনের পশুপাখিদের দিক থেকে অবস্থাটা কতখানি মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা কি আজ আমাদের বিশেষভাবে ভাবা উচিত নয়? এর ফলে আমরাও কিন্তু এগিয়ে চলেছি বিপর্যয়ের দিকে। সর্বত্র যেমন, প্রকৃতির জগতেও তেমনি কতকগুলি নিয়মকানুন আছে। মানুষ যদি সেসব নিয়মকানুনের পরোয়া না করে বনভূমি ও বন্য প্রাণী নির্বিচারে চিহ্নিত করে চলে, তাহলে তার নীট ফল দাঁড়াবে এই যে, প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে আর আমাদের জীবনে অনিবার্য হয়ে উঠবে এক সর্বনাশা পরিণতি।

এভাবে চললে বন্য প্রাণী ও বনভূমি অচিরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, এই আশাঙ্কা আজ দেশের বিশেষজ্ঞদের ভাবিয়ে তুলেছে। ভারত সরকারও যে এ বিষয়ে কতকটা তৎপর হয়ে উঠেছেন, তা-ও আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা শুভ লক্ষণ বলতে হবে।

ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা ও খনিজের সন্ধানের সূত্রে ভারতের বিভিন্ন অরণ্যে বিচরণ করেছি আমি। বনে বনে ঘোরাঘুরি করতে করতে বনের পশুপাখিদের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে এসেছি। তাদের কাছাকাছি থেকে আমার মনে হয়েছে যে তাদের সঙ্গে সহাবস্থান সম্ভব এবং তাদের সংহার না করে সংরক্ষণ করা উচিত।

বনে যারা থাকে তাদের সম্বন্ধে আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার আমি উদ্ঘাটিত করছি পাঠক-পাঠিকাদের সামনে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে পাঠক-পাঠিকারা বুঝতে পারবেন যে শিশুরা যেমন মাতৃক্রোড়ে, তেমনি বন্যরা বনে সুন্দর। মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে যারা হানিকর তারা ছাড়া বনের অধিকাংশ প্রাণীই সংরক্ষণযোগ্য। তারা বেঁচে থাকলে মানুষের জীবন হয়ে উঠবে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আনন্দময়।

॥ দুই ॥

চিরিমিরির গভীর জঙ্গলের মধ্যে আমাদের ক্যাম্প। এখানে আমরা প্রায় পঞ্চাশ জন তাঁবু খাটিয়ে বাস করছি। আমাদের কাজ হল বনের মধ্যে মাটির নীচে কয়লার স্তরের সন্ধান।

সেদিন সারাদিনের কাজের শেষে আমরা ক্যাম্পে ফিরে যে যার তাঁবুতে ঢুকে পড়তে যাচ্ছি, এমন সময় আমাদের গাইড্ দৌলত আমার সহকর্মী গোপীনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, আপনার কাছে আমার একটা নিবেদন আছে হুজুর···

ইতিমধ্যে তাঁবু থেকে গোপীনের স্ত্রী ইলা বেরিয়ে এসেছিল, দৌলতের মুখের ওপরে ভ্রূকুটি হেনে সে বললে, তোমার নিবেদন যাই হোক, তোমার সাহেব কিন্তু এখন বেরোতে পারবেন না।

আহা বেরোতেই যে হবে তার কী কথা আছে!—গোপীন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলে উঠল,—সে রকম কোন জরুরী ব্যাপার না হলে কি আমি বেরোই! বলুকই না ও কী বলতে চায়...

—ও কী বলতে চায় আমার জানা আছে—নিশ্চয়ই কোন শিকারের খবর··· শোনামাত্রই তুমি নাওয়া-খাওয়া ভুলে বেরিয়ে পড়বে···

শিকারের খবর!—গোপীন উৎসুক কণ্ঠে বলে উঠল।—না, না, সে কী করে হবে! তেমন কোন খবর হলে দৌলত নিশ্চয়ই আগেই বলত আমাকে!

মুখ গোমড়া করে ইলা বললে, সে কী আর ও বলে কখনো! কারণ ও জানে তোমাদের কাজের সময়ে ওকথা তোমার কানে ঢুকলেও মনে ঢুকবে না!

গোপীন হেসে ফেলে বললে, তুমি দেখছি দৌলতকে আমার চেয়ে বেশি চিনে নিয়েছ! কি হে দৌলত, চুপ করে আছ কেন—বল কী বলতে চাও···

দৌলত মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, মাইজী যখন চান না যে আপনি এখন বেরোন তখন আর কী হবে খবরটা দিয়ে, কিন্তু চিতাটা সত্যিই বড় উপদ্রব শুরু করেছে—কাল রাতে আমাদের গাঁয়ের মুখিয়ার (মোড়ল) দুধেলা গাইটাকে মেরে ফেলেছে।

শুনছ তো ইলা, দৌলত কী বলছে!—গোপীন উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল,— দৌলতদের গাঁয়ে চিতার উপদ্রব শুরু হয়েছে, ওটাকে না মারলে ওদের গাঁয়ের গরু-ছাগলগুলোকে বাঁচানো মুশকিল হবে!

ঠিকই বলেছেন হুজুর।—উজ্জ্বল হয়ে উঠল দৌলতের মুখ।—ওটাকে এখনই

মারা দরকার। চিতাটা ঐ গাইটাকে আমাদের গাঁয়ের সীমানার বাইরে নালার ধারে মেরে রেখে গিয়েছে। গাইটার লাশের পাশে একটি গাছের ওপরে মাচান বেঁধে রাখতে বলে এসেছি—ওখানে গিয়ে বসলে আজ রাত্রেই পেয়ে যাবেন চিতাটাকে।

আমি বললাম, কী করে জানলে যে চিতাটা আজ রাত্রেই আসবে আবার গরুটার লাশের কাছে?

দৌলত বললে, মেরে রেখে গিয়েছে, খেতে আসবে না?

—মেরেই খায় নি বুঝি?

—খেয়েছে, কিন্তু একবারে অত বড় একটা গরুর লাশের কতটুকু খেয়ে শেষ করতে পারবে বলুন! চিতাটা যত বড়ো হোক না কেন, ঐ গরুটাকে খেয়ে শেষ করতে ওর চার-পাঁচ দিন লেগে যাবে।

সে সুযোগ ওকে দেওয়া হবে না। গোপীন বললে—আজ রাত্রেই ওকে মেরে শেষ করে ফেলব।

আমি বললাম, আচ্ছা গোপীনদা, যতদূর জানি আমাদের দেশে চিতা নেই। এই চিরিমিরির জঙ্গলে চিতা এল কী করে বলতে পারেন?

মৃদু হেসে গোপীন জবাব দিল, চিতা নয় হে, চিতাবাঘ—ইংরেজীতে যাকে



লেপার্ড (Leopard)

লেপার্ড (Leopard) বা প্যান্থার (Panther) বলে। চিতা আর কোথায় পাবে…আফ্রিকাতে আছে হয়তো, কিন্তু তা-ও সংখ্যায় খুব কম।

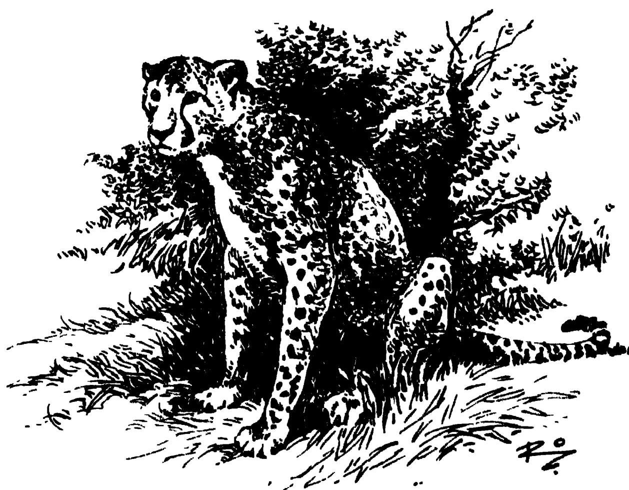
—চিতা ও চিতাবাঘে তফাৎ কী গোপীনদা?

—অনেক তফাৎ। চিতাবাঘ হচ্ছে বাঘের মতই বিড়ালজাতীয় প্রাণী, কিন্তু চিতার মিল রয়েছে কুকুরের সঙ্গে। চিতাকে দেখলে খুব বড়ো আকারের কুকুর বলে মনে হবে। চিতা চিতাবাঘের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগামী। শুধু চিতাবাঘ কেন, যে কোনও জন্তুর চেয়ে জোরে দৌড়তে পারে চিতা—তার গতিবেগ ঘণ্টায়

ত্রিশ-চল্লিশ মাইল পর্যন্ত হতে পারে। চিতা চিতাবাঘের মত হিংস্র হয় না কখনো। ক্ষুধার তাগিদে বুনো শুয়োর বা হরিণ মারলেও চিতা মানুষ বা মানুষের গৃহপালিত পশুদের ওপরে হামলা করে না কখনো। চেষ্টা করলেই চিতাকে পোষ মানানো যায়, কিন্তু চিতাবাঘকে পোষ মানানো অসম্ভব ব্যাপার।

—দুয়ের মধ্যে এতই যখন পার্থক্য, তখন নামের মিল হল কেন ?

—নামের মিল তো আমাদের ভাষায়। ইংরেজীতে চিতাকে 'চিতা' (**Cheetah**) বললেও চিতাবাঘকে 'লেপার্ড' (**Leopard**) বা 'প্যান্থার' (**Panther**) বলে।



চিতা (**Cheetah**)

—আমাদের ভাষায় এই নামের মিল হল কেন বলতে পারেন ?

—দুয়ের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য আছে বলেই হয়েছে। চিতা ও চিতাবাঘের গায়ের চামড়া সাধারণত একই রকম হয়ে থাকে। কালো রঙের ব্ল্যাক প্যান্থার বা ধোঁয়াটে রঙের লেপার্ডকে বাদ দিলে চিতাবাঘের গায়ের চামড়ায় চিতার মতোই হলুদ জমিনের ওপরে কালো ছোপ বা স্পট্‌স্ (**spots**) দেখা যায়, তাছাড়া চিতাবাঘ চিতার মতই গাছে উঠতে পারে।

দৌলত ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠল, এসব আলোচনা পরে করলেও চলবে হুজুর—এখন চলুন রওনা হওয়া যাক। দেরি করলে আমাদের গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে...

এখনই রওনা হবে মানে!—ইলা ঝাঁজালো স্বরে বলে উঠল—নাওয়া-খাওয়া না সেরেই বেরোবে না কি !

গোপীন বললে, আহা চটো কেন ! নাওয়া-খাওয়া সেরেই বেরোবো। সঙ্কর্ষণ, আমাদের সঙ্গে তুমিও যাচ্ছ তো ?

নিশ্চয়ই যাবেন।—ইলা আমার হয়ে জবাব দিল—একা তুমি দৌলতের সঙ্গে গেলে কি আর রাত্রের মধ্যে ফিরে আসবে…হয়তো সেবারের মত পর পর তিন রাত কাটিয়ে আসবে দৌলতদের গাঁয়ে।

গোপীনের নির্দেশমত তাড়াতাড়ি স্নান সেরে খেতে বসলাম আমরা। খেতে খেতে আমি গোপীনকে বললাম, সেদিন একটা বইয়ে পড়েছিলাম যে বাঘের মত চিতাবাঘের সংখ্যাও শিকারীদের নির্বিচার হত্যা অভিযানের ফলে কমে আসছে ক্রমশঃ। আমাদের দেশের বনেজঙ্গলে মোট পাঁচ বা সাত হাজারের বেশি চিতাবাঘ আর অবশিষ্ট নেই এখন…

গোপীন গম্ভীর মুখে বললে, নির্বিচার হত্যা অভিযান কাকে বলছ ! জানো, চিতাবাঘ মানুষের কতখানি ক্ষতি করে থাকে ! চিতাবাঘ নামেই বন্য প্রাণী, তার স্বভাব হচ্ছে লোকালয়ের কাছে ঘুর ঘুর করে বেড়ানো এবং সুযোগ পেলেই গৃহপালিত গরু-ভেড়া-ছাগল এমন কি হাঁস-মুরগী মেরে ফেলা।

আমি বললাম, বনের মধ্যে হরিণ বা বুনোশুয়োরের সংখ্যা কমে আসছে বলেই বোধহয় সে বাধ্য হয়েছে মানুষের পোষা পশুদের দিকে নজর দিতে।

—মোটেই তা নয়। আসলে বনের মধ্যে হরিণ বা শুয়োর মারতে যে পরিশ্রম হয়, তার তুলনায় অনেক সহজে মানুষের পোষা জানোয়ারদের বাগে আনতে পারে বলেই সে তার খাদ্য সংগ্রহের জন্য লোকালয়ে চলে আসে। সুযোগ পেলে সে মানষ মেরেও খায়…

—তাই নাকি !

—মানুষ মানে শিশু বা দশ-বারো বছরের ছেলেমেয়ে…জোয়ান বয়সী মানুষদের দিকে সহজে ঘেঁষতে চায় না সে। কারণ সে জানে যে জোয়ান বয়সী মানুষদের অনেকেরই হাতে হাতিয়ার থাকে…ভারি ধূর্ত এই চিতাবাঘ…

আমি বললাম, কিন্তু আমি শুনেছি যে, আফ্রিকার জঙ্গলে চিতাবাঘের সংখ্যা কমে আসছে বলে বুনো বাঁদর ও শুয়োর সংখ্যায় অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গিয়ে লোকালয়ে এসে ফসল নষ্ট করছে ব্যাপকভাবে…সেজন্য চিতাবাঘ শিকারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা পর্যন্ত জারি করা হয়েছে…

গোপীন বললে, দেখ ভাই, আমাদের দেশ আফ্রিকা নয়…এদেশের চিতাবাঘ বুনো বাঁদর বা শুয়োর মেরে তাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে এমন কথা শুনি নি কখনো। আমার যতদূর অভিজ্ঞতা, এদেশে চিতাবাঘ মাত্রই মানুষের ক্ষতি করে থাকে। চিতাবাঘের উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাকে মেরে না ফেলে কোন উপায় নেই।

এর পর আমি আর কোন কথা বললাম না।

খাওয়া-দাওয়া সেরে জীপে করে রওনা হলাম আমরা। গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কাঁকরে-ছাওয়া রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে বৈকুণ্ঠপুরের দিকে—সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে চলি আমরা।

প্রায় মাইল দশেক একটানা চলার পর আমরা নেমে এলাম চিরিমিরি পাহাড় থেকে। নীচের দিকে বনের ঘনত্ব অনেক বেশি—ওপর থেকে দেখে মনে হয় যেন একটা প্রকাণ্ড নীল রঙের কার্পেট দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে নীচের সমতল ভূমিকে।

নীচে নেমে এসে বৈকুণ্ঠপুরের সড়ক ছেড়ে দিয়ে আমরা একটা কাঁচা রাস্তা ধরলাম। রাস্তাটা গরুর গাড়ি চলাচলের উপযোগী। তার ওপর দিয়ে অনেক কষ্টে জীপটাকে চালিয়ে নিয়ে যায় গোপীন। রাস্তাটা এত সরু যে পথের ধারের গাছপালাকে ছুঁতে পারি আমরা হাত বাড়িয়ে।

এই কাঁচা রাস্তা দিয়ে ঘণ্টাখানেক চলবার পর টেংনী গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছলাম আমরা।

দৌলত বললে, এই আমাদের গ্রাম টেংনী—গাঁয়ের বাইরে নালার ধারে চিতাটা গরুটাকে মেরেছিল। যেখানে মেরেছিল, লাশটা সেখানেই পড়ে আছে—আমরা তাকে সরাইনি।

গোপীন বললে, ওখানে কী জঙ্গল খুব ঘন?

—না হুজুর, জঙ্গল ওখানে পাতলা হতে শুরু করেছে। আশেপাশে কিছু কাঁটাঝোপ ও কয়েকটা 'বীজা' গাছ আছে।

—মাচান বেঁধেছ কোথায়?

—গরুর লাশের সামনেই হুজুর। একটা 'বীজা' গাছের মাথায় বেঁধে রেখেছি।

—ঠিক আছে, চল এখন নালার ধারে যাই আমরা।

নালার ধারে একটা ফণীমনসার ঝোপের পাশে গরুর মৃতদেহটি পড়েছিল। তার ঘাড়ের কাছে অনেকখানি মাংস খুবলে নিয়েছে চিতাবাঘটা—গরুটাকে মেরে ফেলেই সে তার মাংস খেতে শুরু করেছিল বোধ হয়।

গোপীন প্রশ্ন করল, গরুটাকে মারল কখন?

কাল রাত্রে হুজুর।—দৌলত জবাব দিল।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। গাছপালা, ঝোপ-ঝাড়ের মাঝখানকার ফাঁকগুলোতে ক্রমশঃ অন্ধকার জমতে থাকে। দৌলত ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, সময় হয়ে এসেছে হুজুর…চলুন গাছের ওপরে মাচানে চড়ে বসি আমরা…

আমি বললাম, চিতাবাঘ তো গাছে উঠতে পারে…মাচানের ওপরে চড়ে বসে কী লাভ আছে কোন?

দৌলত বললে, অনেক উঁচুতে মাচানটা বেঁধে রেখেছি হুজুর। অতটা উঁচুতে উঠতে সময় লাগবে ওর···তার আগেই ওকে গুলি করে ঘায়েল করতে পারবেন। তা ছাড়া চিতাটা গরুর লাশ ছেড়ে অন্য দিকে নজর দেবে বলে মনে হয় না···

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, চিতাবাঘটা যদি টের পেয়ে যায় যে আমরা গাছের ওপরে বসে আছি!

গোপীন বললে, চুপচাপ নিঃসাড় হয়ে বসে থাকলে টের পাবে কী করে!

—গন্ধে গন্ধে টের পেয়ে যেতে পারে···ওদের আঘ্রাণ শক্তি তো খুবই বেশি!

—গরুর মাংসের গন্ধ ছাপিয়ে কী আর আমাদের গন্ধ ওর নাকে আসবে! আর কোন কথা নয়, এখন চল মাচানের ওপরে উঠে বসি আমরা। কই হে দৌলত, মাচানটা কোন্ গাছের ওপরে বেঁধে রেখেছ? মাচানে চড়বার জন্য মইয়ের ব্যবস্থা আছে তো?

দৌলত বললে, আছে হুজুর—মইটা গাছের সঙ্গেই লাগানো আছে। এই যে এই গাছটার ওপরে মাচান বাঁধা আছে, পাশেই মইটা রয়েছে, উঠে পড়ুন হুজুর।

গোপীন জীপের পেছন থেকে বের করে আনল তার রাইফেল ও রাইফেলের গুলি ভর্তি ব্যাগ। তারপর দৌলতকে বললে, স্পটলাইট ও ব্যাটারিটা বের করে নিয়ে এস দৌলত।

'স্পটলাইট' অনেকটা গাড়ির হেডলাইটের মত দেখতে। ধরবার জন্য তার সঙ্গে হ্যাণ্ডেল লাগানো আছে—জ্বালবার জন্য আছে সুইচ। ব্যাটারি লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল—তার আলো হেডলাইটের মতই জোরালো।

স্পটলাইট ও ব্যাটারি নিয়ে গরুর মৃতদেহটির উত্তর দিকের 'বীজা' গাছটির দিকে এগিয়ে গেল দৌলত। মৃতদেহটির পাশেই দক্ষিণ দিকে একটি গাছ থাকতে উত্তর দিকের গাছটি সে বেছে নিল কেন ভেবে পেলাম না আমি। দৌলতকে প্রশ্ন করতে সে বললে, এখন তো মার্চ মাস—বাতাস বইছে দক্ষিণ দিক থেকে···দক্ষিণের গাছে বসলে দক্ষিণের বাতাসে আমাদের গায়ের গন্ধ গরুর লাশটির দিকে ভেসে যাবে···চিতার নাকে গিয়েও লাগবে···

গোপীন খুশী হয়ে বললে, ওয়াণ্ডারফুল···সত্যিই অসাধারণ তোমার উপস্থিত বুদ্ধি দৌলত।

দৌলতকে অনুসরণ করে 'বীজা' গাছটির একেবারে মাথার কাছে বাঁধা মাচানে চড়ে বসলাম আমরা।

মাচানটি আসলে একটি বড়ো আকারের দড়ির খাটিয়া। গাছের ডালগুলোর সঙ্গে দড়ি দিয়ে মজবুত করে তা বাঁধা ছিল।

বেশ জুৎ করে বোসো ভাই।—গোপীন ভাল করে পরীক্ষা করে বললে, —ভালো করেই বাঁধা আছে—কাজেই পড়ে যাওয়ার ভয় নেই কোন।

মাচানের ওপরে পাশাপাশি বসলাম আমরা তিনজনে। গোপীনের হাতে তার রাইফেল, দৌলতের হাতে স্পটলাইট। গোপীন বসল আমার আর দৌলতের মাঝখানে।

গোপীন বললে, আর একটাও কথা নয়…এখন থেকে আমাদের একেবারে চুপচাপ বসে থাকতে হবে… জোরে নিঃশ্বাস নেওয়াও চলবে না! বাঘ ও চিতা-বাঘের কান খুব সজাগ…

চুপচাপ একেবারে নিঃসাড় হয়েই বসে থাকি আমরা। বনের মধ্যে কোন সাড়াশব্দ নেই। পাখির কিচির-মিচিরও শোনা যাচ্ছে না। অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে তারা বুঝি সব ঘুমিয়ে পড়েছে।…

কৃষ্ণপক্ষের রাত। গাছপালাগুলো সব অন্ধকারে একাকার হয়ে গিয়েছে। নীচে গরুর মৃতদেহটিও আর দেখা যাচ্ছে না।

গোপীন আঙ্গুল তুলে ইশারা করতে দৌলত স্পটলাইটের সুইচ টিপল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারকে তলোয়ারের মত চিরে ফেলল স্পটলাইটের চোখ ঝলসানো আলো।

নীচের ঝোপঝাড়ের ওপরে স্পটলাইটের আলো নড়ে চড়ে—মাঝে মাঝে গরুর মৃতদেহটিকে ছুঁয়ে যায়।

অন্ধকারের মধ্যে ইতস্ততঃ স্পটলাইটের আলোর ঝাঁটা বুলোতে বুলোতে দৌলত হঠাৎ একটি কুঁচি-লতার ঝোপের ওপরে আলোটাকে এনে থামাল।

আলো স্থির…দৌলতও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কুঁচি-লতার ঝোপের দিকে…তার দৃষ্টি অনুসরণ করে গোপীনও তাকায় সেদিকে।

হঠাৎ কুঁচি-লতার ঝোপটি নড়ে উঠল…ঝোপের আড়ালে কী যেন লুকিয়ে আছে…হয়তো চিতাবাঘ…সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় আমার হৃৎপিণ্ডের গতিবেগ।

রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে থাকি কুঁচি-লতার ঝোপটির দিকে…হঠাৎ কী যেন বেরিয়ে এল ঝোপের আড়াল থেকে…স্পটলাইটের আলো তাকে ছোঁবার আগেই সে ছুটে এল গরুর মৃতদেহটির দিকে…

উঁচিয়ে ধরল গোপীন তার রাইফেল,…সেই ছুটন্ত ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ করে তার রাইফেলের নল…

কেঁপে ওঠে স্পটলাইটের আলো,…দৌলত আর্তস্বরে বলে উঠল, গুলি করবেন না হুজুর…ও চিতাবাঘ নয়!

আলো ফেলো ওর ওপরে।—গোপীন অস্ফুট স্বরে বলে উঠল—তোমার হাত কাঁপছে কেন? কী হয়েছে?

—ও আমার মেয়ে রগ্‌গী হুজুর।

—তোমার মেয়ে!

—হ্যাঁ হুজুর, এই দেখুন।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে গরুর মৃতদেহের ওপরে আলো ফেলল দৌলত। সেই আলোতে দেখতে পেলাম যে, একটি বারো তেরো বছরের মেয়ে গরুটির পা ধরে টানাটানি করছে।

ও কী করছে তোমার মেয়ে!...গোপীন অবাক হয়ে বলল,—গরুটাকে ধরে টানাটানি করছে কেন?

—সে কী করে বলব হুজুর! মা-মরা মেয়ে দিন দিন জেদী ও একরোখা হয়ে উঠছে...ওর মতিগতি কিছুই বুঝিনে আমি।

রগ্‌গী ততক্ষণে গরুর লাশটাকে টেনে নিয়ে চলেছে নালার ধারের কাঁটা ঝোপের দিকে।

অদ্ভুত গায়ের জোর তো তোমার মেয়ের!—গোপীন অবাক হয়ে বললে,—কিন্তু লাশটাকে নালার ধারে নিয়ে যাচ্ছে কেন?

সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে হুজুর!—অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করে উঠল—ওপাশের ঝোপটা যেন নড়ে উঠল...বোধহয় চিতাবাঘ...

চুপ।—গোপীন ফিস্‌ফিসিয়ে বললে—একেবারে চুপ,...ওপাশে আলো ফেল...

কিন্তু আমার মেয়ের ওপরে চিতাবাঘটি যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে!—স্পটলাইট সুদ্ধ কাঁপতে থাকে দৌলতের হাত।

—শাট্ আপ।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে একটা আবর্তের সঞ্চার হল...তীরের বেগে ছুটে আসে একটা কালো স্রোত...

আলো ফেলবার ক্ষমতা নেই দৌলতের—তার হাত কাঁপছে থর থর করে। গোপীন আলোর জন্য অপেক্ষা না করে গুলি করল...

গোপীনের রাইফেলের গুলির সঙ্গে সুর মেলাল চিতাবাঘের গর্জন...পরমুহূর্তে মাটির ওপরে ভারি একটা কিছু পতনের শব্দ শোনা গেল।

আমার মেয়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল বুঝি চিতাবাঘ!—হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল দৌলত।

আলো ফেলেই দেখ না চিতাবাঘটা কি করছে।—ধমক দিয়ে উঠল গোপীন।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে আলো ফেলল দৌলত। রগ্‌গী যেখানে গরুর মৃতদেহটির পা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, তার কাছাকাছি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে খুব বড়ো আকারের একটি চিতাবাঘের রক্তাক্ত দেহ। একেবারে নিসাড় ও নিস্পন্দ... বোধ হয় এক গুলিতেই ঘায়েল হয়েছে।

দৌলত অবাক হয়ে বললে, অন্ধকারের মধ্যেই ওকে ঘায়েল করেছেন হুজুর··· নিশান করলেন কী করে স্যার !

গোপীন মৃদু হেসে বললে, সব তোমার ও তোমার মেয়ের ভাগ্য দৌলত।··· আমার রাইফেলের গুলি ফসকে গেলে সেটা কিন্তু তোমার দোষেই হত···এমনি ঘাবড়ে গেলে যে আলো পর্যন্ত ফেলতে পারলে না।···

দৌলত গদ্‌গদ্‌ স্বরে বললে, আপনিই আমার মেয়ের জান বাঁচিয়েছেন হুজুর··· কী বলে যে আপনাকে···

—থাক, থাক হয়েছে—এখন নামো দির্কিন গাছ থেকে·· দেখ তোমার মেয়ে কী করছে।

গাছ থেকে নেমে চিতাবাঘটিকে পরীক্ষা করি আমি ও গোপীন। টর্চ জ্বেলে মাপবার চেষ্টা করি চিতাবাঘটাকে···ল্যাজের ডগা থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত প্রায় সাত হাত লম্বা হবে। গোল গোল কালো ছোপ ধরা গায়ের হলুদ চামড়া ঝলমল করে টর্চের আলোয়। গুলি লেগেছে ঘাড়ের কাছে—যাকে বলে নেক্‌শট্‌। অজস্র রক্তক্ষরণ হচ্ছে ক্ষতস্থান থেকে।

দৌলত রগ্‌গীর কাছে এগিয়ে গিয়েছিল। সে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ছুটে এল আমাদের দিকে। আমাদের দুজনের দিকে কয়েক সেকেণ্ড নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকার পর রাইফেলধারী গোপীনের মুখের পানে অগ্নিদৃষ্টি হেনে সে বললে, তুমিই মেরেছ বুঝি চিতাটাকে ?

গোপীন জবাব দিল, হ্যাঁ মেরেছি···

কেন মারলে ?—কান্নায় কাঁপানো স্বরে বললে রগ্‌গী—কী করেছিল ও তোমার !

—আমার কিছু করেনি, কিন্তু তোমাদের গাঁয়ের মুখিয়ার গরুটাকে মেরেছিল। এরপর হয়তো তোমাদের গাই-ভেড়ার দিকেও নজর দিত।

—তা না হয় দিত···ক্ষিদে পেলে জানোয়ার মেরে ও খাবেই—ও তো আর আমাদের মত ডাল-ভাত-রুটি খেয়ে থাকতে পারবে না···তাই বলে ওকে মেরে ফেলবে ?

নিশ্চয়ই মেরে ফেলতে হবে।—দৌলত রাগত স্বরে বলে উঠল—আমাদের গরু-ছাগল মেরে ফেলবে ও···আর আমরা ওকে ছেড়ে দেব !

গোপীন বললে, গোরুর লাশটাকে ধরে তুমি টানাটানি করেছিলে কেন রগ্‌গী ?

লাশটাকে লুকিয়ে রাখব ভেবেছিলাম। রগ্‌গী জবাব দিল—নালার ধারে একটা গুহার মত আছে, সেখানে নিয়ে গেলে লাশটাকে আর তোমরা খুঁজে পেতে না। লাশটাকে না পেলে চিতাটারও নাগাল পেতে না।

—চিতাবাঘটাও তো খুঁজে পেত না লাশটাকে—তুমি যেখানে লাশটাকে

লুকিয়ে রাখতে, সে জায়গাটি কী আর চিতাবাঘটি খুঁজে পেত!

—ওটা তো ওরই আস্তানা···দিনের বেলায় ওখানে ওকে লুকিয়ে থাকতে দেখেছি!

গোপীন বললে, ঐ গুহাটা আমাদের দেখিয়ে দেবে রগ্‌গী? হয়তো অন্য কোন চিতাবাঘ, মানে ওর জোড়টা ওখানে লুকিয়ে থাকতে পারে···

না, না, কক্ষনো না।—রগ্‌গী চিৎকার করে উঠল—আমি কক্ষনো তোমাদের ঐ গুহাটা দেখাব না···আচ্ছা বাবু, ভগবান তো তোমার আমার মত ওদেরও প্রাণ দিয়েছেন···ওদের মেরে ফেলা কী পাপ নয়?

মৃদু হেসে গোপীন বললে, দেখ রগ্‌গী, আজ আমি ঐ চিতাবাঘটাকে মেরে না ফেললে ও তোমাকেই মেরে ফেলত। ও তো আর বোঝে নি যে তুমি গরুর লাশটাকে ওর আস্তানার দিকে নিয়ে যাচ্ছ—ও তোমার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল···

না না কক্ষনো না।—রগ্‌গী কাঁদতে কাঁদতে বললে ও আমাকে চিনত··ওর আস্তানার কাছে কতবার গিয়েছি আমি, ও আমাকে কিছু বলেনি।

॥ তিন ॥

মধ্যপ্রদেশের অরণ্য অঞ্চলের একেবারে মাঝখানে রয়েছে চিরিমিরির কয়লাক্ষেত্র। বনের ঘনত্ব এখানে খুবই বেশি। শাল, পিয়াশাল, আসান ও মহুয়াগাছ যেন জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝখানে যেটুকু ফাঁক আছে তাকে ভরে দিয়েছে বাঁশগাছ ও বুনো লতার ঝোপ। এখানে মানুষের যাতায়াত নেই, কাজেই পথঘাট কিছুই চোখে পড়ে না—পায়ে-চলা পথেরও কোন আভাস পাওয়া যায় না। তাই পথ চলার জন্য ঝোপঝাড় কেটে পথ তৈরি করে নিতে হয় আমাদের।

সেদিন খার্সোটি নালার ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাতির শুঁড়ের মত সরু একটি পথের সন্ধান পেয়ে গেলাম আমরা।

পথ দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠে গোপীন বললে, যাক্. আজ আমাদের পথ তৈরি করতে হবে না। পথটা ধরে এগিয়ে গেলে নালার ধারে পৌঁছাতে পারব তো দৌলত ?

পারবেন হুজুর।—আমাদের গাইড দৌলত জবাব দিল,—নালার ধার পর্যন্তই যেতে পারবেন এ পথ ধরে।

নালার ধার পর্যন্ত যেতে পারব শুধু!—গোপীন বিস্ময় প্রকাশ করে বললে,—এ পথ কি কোন গাঁয়ের দিকে যায় নি ?

—এদিকে কোন গাঁ-ই নেই. গাঁয়ের দিকে যাবে কী হুজুর।

—গাঁ নেই তো পথ তৈরী হল কি করে ?

—এ তো মানুষের পায়ে-চলা পথ নয় হুজুর, বুনো জানোয়ারদের পায়ে পায়ে এই রাস্তা তৈরী হয়েছে, এই রাস্তা দিয়ে নালার ধারে যায় তারা জল খেতে।

কারা দৌলত ?—উৎসুক কণ্ঠে এবার প্রশ্ন করি আমি,—মানে কোন্ কোন্ জানোয়ার যায় জল খেতে ?

যায় হরিণ, সম্বর ও বুনো শুয়োর।—দৌলত জবাব দিল,—বনময়ূর ও মোরগের পালও যায়।

—বাঘ যায় না ?

যায় হুজুর, তবে খুবই কদাচিৎ। কারণ বাঘ থাকে এখান থেকে দশ মাইল দূরে বাসেরের জঙ্গলে।

আমি প্রশ্ন করলাম, বাঘ বুঝি বাসেরের জঙ্গল ছেড়ে নড়তে চায় না ?

দৌলত জবাব দিল, হ্যাঁ হুজুর, বাঘ নিজের এলাকার মধ্যেই থাকতে চায়।

তবে খরার সময় যখন বাসেরের জঙ্গলের ঝরনাগুলো সব শুকিয়ে যায়, তখন জল খেতে আসে এদিকে।

—বাসেরের কাছে একটা জলপ্রপাত আছে না?

—আছে হুজুর, অমৃতধারা তার নাম। কিন্তু সেখানে লোকজনের আনাগোনা এত বেশি যে, বাঘ এদিকে ঘেঁষতে চায় না সহজে। জানেন নিশ্চয়ই যে, বাঘ সাধারণতঃ মানুষকে এড়িয়ে চলতে চায়।

গোপীন বললে, মানুষখেকো হলে অবশ্য মানুষকে এড়িয়ে চলতে চাইবে না।

দৌলত বললে, মানুষখেকো বাঘের স্বভাব-চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা হুজুর।

—মানুষখেকোর কথা থাক, এখন বল খার্সৌটি নালার ধারে আমরা বাঘের দেখা পেতে পারি কি-না।

—পেতে পারেন হুজুর, কারণ এখন খরার সময়। যতদূর জানি, বাসেরের জঙ্গলের পাহাড়ী নালা ও ঝরনাগুলো সব এখন শুকিয়ে গিয়েছে। কাজেই খার্সৌটি নালার ধারে ওদের জল খেতে আসা অসম্ভব কিছু নয়।

তুমি বলতে চাও যে, খার্সৌটি নালার ধারে বাঘের দেখা আমরা পেয়ে যেতে পারি!—ঈষৎ কম্পিত স্বরে আমি বলে উঠলাম।

দৌলত বললে, তা পেয়ে যেতে পারি।

তাহলে আর এগিয়ে গিয়ে কাজ নেই।—আমি থমকে দাঁড়াই।

ভয় পাচ্ছ কেন!—গোপীন হেসে ফেলে বললে—আমার সঙ্গে তো রাইফেল আছে।…

—কিন্তু আমার সঙ্গে রাইফেল বা বন্দুক কিছুই নেই, বাঘ আমাকে আক্রমণ করলে আমি কি করব বলতে পারেন?

—বাঘ তোমাকে কখনোই আক্রমণ করবে না। কারণ মানুষখেকো ছাড়া অন্য কোন বাঘ আক্রান্ত না হলে কাউকে কখনো অকারণে আক্রমণ করে না। কি বল দৌলত?

দৌলত বললে, ঠিকই বলেছেন হুজুর, বন্য জন্তুদের মধ্যে বাঘকে রীতিমত ভদ্রলোক বলা চলে।

গোপীন মুচকি হেসে বললে, ভদ্রলোক হোক বা নাই হোক, বাঘকে বাগে আনতে পারলে আমি ছেড়ে দিই না—সুযোগ পেলেই আমি বাঘ শিকার করি।

দৌলত বললে, সুযোগ হয়তো আজ পেয়ে যেতেও পারেন হুজুর।

দেখা যাক।—বলে গোপীন তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে ইতস্ততঃ।

খার্সৌটি নালার কাছাকাছি গিয়ে আমরা পৌঁছতেই দৌলত থমকে দাঁড়িয়ে বললে, খুব সাবধান হুজুর, মনে হচ্ছে বাঘ নিকটেই আছে।

কি করে বুঝলে?—আমি ফিসফিসিয়ে শুধোই।

গলার স্বর একেবারে খাদে নামিয়ে দৌলত বললে, দেখতে পাচ্ছেন না চারদিক কি রকম চুপচাপ হয়ে গিয়েছে, পাখীরাও ডাকছে না!

তাই তো!—আমি ঢোঁক গিলে বললাম।

গোপীন মুখে কিছু না বললেও তার মুখের ভাব দেখে বুঝলাম যে, কাছাকাছি বাঘের অস্তিত্ব সে-ও যেন টের পেয়ে গিয়েছে।

নালার ধারে পৌঁছে দৌলত অস্ফুট উত্তেজিত স্বরে বললে, ঐ দেখুন হুজুর—আমার অনুমান ভুল নয়!

বাঘ নাকি!—চাপা আর্ত কণ্ঠে বলে উঠলাম আমি।

—বাঘ নয়, বাঘের শিকার করা সম্বর।

সম্বর!—অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করে দৌলতের দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি যে, নালার ধারে কাঁটাঝোপের পাশে একটি বড় আকারের হরিণের মৃতদেহ পড়ে আছে।

সম্বরটির ঘাড়ের কাছে গভীর ক্ষত, সর্বাঙ্গে টাটকা রক্তের দাগ।

দৌলত ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে, বাঘটা একটু আগেই সম্বরটাকে মেরে ফেলেছে। আমাদের পায়ের শব্দ শুনে হয়ত সটকে পড়েছে কাছাকাছি কোথাও।

আমি বললাম, বাঘই যে মেরেছে তা বুঝলে কি করে?

—এত বড় সম্বরকে কাবু করার ক্ষমতা বাঘ ছাড়া আর কারুরই নেই হুজুর।

—চিতাবাঘেরও নেই বলতে চাও?

—না হুজুর, চিতাবাঘও পারবে না এত বড় সম্বরকে বাগে আনতে। তা ছাড়া এদিককার চিতাবাঘের নজর হচ্ছে মানুষের পোষা গোরু-ছাগলের দিকে, হরিণ বা সম্বর শিকারের জন্য কষ্ট স্বীকার করতে সে রাজী নয়।

গোপীন তার রাইফেলের 'সেফটি ক্যাচ' খুলে দিয়ে বললে, দেখে মনে হচ্ছে সম্বরটাকে মেরে ফেলেই বাঘটা সরে পড়েছে।

দৌলত বললে, হ্যাঁ হুজুর, সম্বরটাকে খাবার সুযোগ সে পায় নি।

—খেতে আসবে নিশ্চয়ই সে আবার। হয়তো শিগগিরই আসবে।

—আসবে বই কি, আমরা চলে গেলেই আসবে।

—চলো আমরা ঐ বন-হলুদ গাছের ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকি চুপচাপ। বাঘ আমাদের সাড়াশব্দ না পেয়ে ভাববে বুঝি আমরা চলে গিয়েছি। তখন সে বেরিয়ে আসবে তার লুকোবার জায়গা থেকে।

দৌলত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে গোপীনের মুখের পানে তাকিয়ে থেকে ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, বাঘের এত কাছে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকবেন—আপনার কী মাথা খারাপ হয়েছে হুজুর!

গোপীন গম্ভীর মুখে বললে, মাথা খারাপ হবে কেন, মুখোমুখি মোকাবিলা করব আমি বাঘের সঙ্গে।

—মুখোমুখি বাঘ শিকার করা খুবই বিপজ্জনক হুজুর, এক গুলিতে বাঘকে শেষ করতে না পারলে সে ঝাঁপিয়ে পড়বে আপনার ওপরে। বাঘ শিকার করতে চান তো আমার লোকজন নিয়ে এসে ঐ সম্বরের লাশটার সামনের অর্জুন-গাছের ওপরে মাচান বেঁধে দেব, মাচানের ওপরে বসে নিরাপদে শিকার করতে পারবেন বাঘটাকে। আপনার রাইফেলের নিশানা ফস্কে গেলেও বাঘটা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

—তোমার লোকজন এনে মাচান বাঁধতে বাঁধতে তো বাঘ তার খাওয়া শেষ করে সরে পড়বে এখান থেকে।

—না হুজুর, এত বড় একটা সম্বরকে একদিনে খেয়ে শেষ করতে পারবে না বাঘটা।

—কি করে জানলে যে বাঘটা একাই আছে? হয়তো সে তার বাঘিনীকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

—দুটোতে মিলেও সম্বরটাকে খেয়ে শেষ করতে পারবে না একদিনে।

না দৌলত।—গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে গোপীন বললে,—আজ বাঘের সঙ্গে মুখোমুখিই লড়ব আমি. দেখো আমার রাইফেলের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

আমি কম্পিত স্বরে বললাম, এরকম একটা রিস্ক নেওয়া কি ঠিক হবে গোপীনদা?

গোপীন বললে, ভয় পেয়েছ নাকি তুমি? ভয় পেয়ে থাকলে চলে যেতে পার।

না, না, ভয় কিসের!—আমি ভয়ার্ত স্বরে বললাম।

গোপীন বললে, দৌলত, তুমিও ভয় পাচ্ছ নাকি?

না হুজুর।—দৌলতের সুপুষ্ট গোঁফ জোড়ার নীচে মৃদু হাসি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল,—ভয় আমি পাই নি। আমি শুধু আপনাদের জন্য উদ্বেগ বোধ করছি।

—আমাদের জন্য তোমাকে উদ্বিগ্ন হতে হবে না। এস, ঐ বন-হলুদ গাছের ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে বাঘ-মহারাজের জন্য অপেক্ষা করা যাক্।

বন-হলুদ গাছ আকারে ছোট হলেও বেশ ঘন ঝোপ সৃষ্টি করেছে। তার আড়ালে একটা ফাঁকা জায়গা বেছে বসে পড়লাম আমরা।

এখান থেকে কয়েক গজ দূরে পড়ে আছে সম্বরের মৃতদেহটি। ডালপালা ও লতাপাতার ঘন আচ্ছাদনের মধ্য দিয়েও তাকে দেখতে পাচ্ছি আমরা। কয়েকটা গাছের ডাল ভেঙ্গে ফেলে ঝোপের মধ্যে খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে ফেললে

গোপীন। তারপর তার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে বসে পড়ল সে তার রাইফেল উঁচিয়ে।

ইতিমধ্যেই আঙ্গুল তুলে সে ইঙ্গিত করেছে আমাদের চুপ করে থাকতে। তারপর একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সম্বরের মৃতদেহটির দিকে।

চারদিক নিস্তব্ধ। আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। বনের গাছপালাগুলোও সব নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে···

একটানা প্রায় ঘণ্টাখানেক চারপাশের গাছপালাগুলির মতই অসাড় হয়ে বসে রইলাম আমরা। আমার মনে হল, আর বেশিক্ষণ এমনি বসে থাকলে বুঝি আমাদের পা থেকে শিকড় গজাবে, তারপর গাছে রূপান্তরিত হয়ে যেন এই বনের মধ্যেই চিরস্থায়ীভাবে স্থান পেয়ে যাব।

হঠাৎ দৌলতের মুখে-চোখে একটা চাপা উত্তেজনা ঝিলিক দিয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুল তুলে ইঙ্গিত করে সে সামনের দিকে।

দৌলতের উত্তেজনা নিমেষে সংক্রামিত হল আমার মনের মধ্যে। সচকিত হয়ে আমিও তাকালাম দৌলতের দৃষ্টি অনুসরণ করে।

সম্বরের মৃতদেহটি থেকে অল্প একটু দূরে একটা কাঁটাঝোপ অল্প অল্প নড়ছে!

কাঁটাঝোপটির সঙ্গে আমার বুকের ভেতরটাও কাঁপতে শুরু করে···ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে কপালে···ঠাণ্ডা হয়ে আসে হাত দুটো।

কাঁটাঝোপের আড়াল থেকে প্রথমে বেরিয়ে আসে দুটি বাঘের বাচ্চা, তাদের পেছনে পেছনে একটি বাঘিনী। বাচ্চাদুটি আকারে পূর্ণবয়স্ক দেশী কুকুরের মত, বাঘিনীটা প্রকাণ্ড—ল্যাজের ডগা থেকে মাথা পর্যন্ত মাপলে প্রায় হাত দশেক হবে।

তখন সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে, গাছপালা ও ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে ছায়া ঘনিয়ে এসেছে।

সম্বরের ওপরে সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল বাঘের বাচ্চাদুটি, তাদের নিরস্ত করল বাঘিনীটি। একটু তফাতে তাদের সরিয়ে রেখে সে নিজে এগিয়ে গেল সম্বরের দিকে।

শাবকদের বঞ্চিত করে বাঘিনীটা একাই সম্বরের মাংস খেতে চায় নাকি? কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা নয়। যতই হিংস্র হোক, বাঘ—বিশেষ করে বাঘিনী স্বার্থপর নয়, সন্তান লালন-পালনে অন্য কোনও প্রাণীর তুলনায় কম তৎপর নয় সে। তা হলে বাঘিনীটা তার বাচ্চাদুটিকে ওরকম করে ঠেলে সরিয়ে দিল কেন?

বাঘিনীটা সম্বরের ঘাড়ের ওপরে ঝুঁকে পড়ে তার ক্ষতস্থানটি চাটল বারকয়েক। তারপর তার ধারালো দুপাটি দাঁত দিয়ে ঘাড় থেকে শুরু করে পিঠ পর্যন্ত চামড়া ছাড়িয়ে নিতে থাকে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই চামড়ার আবরণমুক্ত হয়ে সম্বরের

ঘাড় ও পিঠের রক্তবর্ণ মাংসপেশীগুলি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

এবারে বুঝি সে খেতে শুরু করবে। সম্বরটির ঘাড় ও পিঠের মাংসল অংশ-গুলির উপর থাবা বুলিয়ে সে পরীক্ষা করে, যেন কোথা থেকে খাওয়া শুরু করবে তা ঠিক করার চেষ্টা করছে।

কিন্তু খেতে আদৌ শুরু করল না বাঘিনীটা। খানিকক্ষণ ছাল-ছাড়ানো অংশটা পরীক্ষা করার পর শাবকদুটির কাছে আসে সে, তারপর তাদের নিয়ে আবার এগোয় সম্বরের মৃতদেহের দিকে।

সম্বরের পিঠের কাছে বড়ো একটি মাংসল অংশ নির্বাচন করে বাচ্চাদুটিকে খাওয়া শুরু করতে ইঙ্গিত করল বাঘিনীটা, কি করে খেতে হবে দেখাবার জন্য নিজেও আরম্ভ করল খেতে।

বাঘিনীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বাচ্চাদুটিও খেতে থাকে। বাঘিনীটা যখন বুঝল যে বাচ্চাদুটি স্বাধীনভাবেই পারবে খেতে, তখন সে খাওয়া বন্ধ করে সরে এল একটু তফাতে এবং মাটির ওপরে বসে পড়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাচ্চাদুটির খাওয়া দেখতে থাকে।

মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকি আমি বাঘিনী ও তার বাচ্চাদুটির দিকে। বনেজঙ্গলে অনেক ঘুরেছি আমি, বন্য জন্তুদের সঙ্গে বহুবার সাক্ষাৎকার ঘটেছে আমার, কিন্তু এমন অপরূপ দৃশ্য আগে কখনো দেখি নি। জীবজগতে সন্তানস্নেহ নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু বাঘিনীর সন্তান-বাৎসল্য পরম বিস্ময়কর বলে ঠেকে আমার চোখে।

এ দৃশ্য আর বেশিক্ষণ দেখতে পাব না ভেবে মনে মনে ব্যথিত বোধ করলাম। কারন গোপীন ওদিকে রাইফেল উঁচিয়ে বসেছে। বোধ হয় বাঘিনীর মাথা কিংবা হৃৎপিণ্ডকে তাক করছে। যে কোনও মুহূর্তে রাইফেলের ট্রিগারে তার আঙ্গুলের চাপ পড়বে, সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠবে রাইফেল, মাটিতে লুটিয়ে পড়বে বাঘিনীর রক্তাক্ত কলেবর। বাঘিনীর পর তার বাচ্চাদুটিকেও সে মারবে নিশ্চয়ই। এমনিতে যত ভাল মানুষ হোক না কেন গোপীন, শিকারের ব্যাপারে সে নৃশংস। শিকারে বেরোবার সময় সে তার দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা ঘরে রেখে আসে। তার সামনে এসে পড়লে যে কোনও পশু বা পাখীর মৃত্যু অনিবার্য। নিরীহ হরিণ, বন-ময়ূর বা খরগোশকেও সে অব্যাহতি দেয় না। আজ তার রাইফেলের নলের সহজ নাগালের মধ্যে এসে পড়া বাঘিনী ও বাঘের বাচ্চাদুটিকে যে সে ছেড়ে দেবে না, তা বলাই বাহুল্য।

রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করি আমি কখন গোপীনের রাইফেলের নল থেকে একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে এসে সামনের ঐ সুন্দর ছবিটাকে চুরমার করে দেবে।

কিন্তু আস্তে আস্তে রাইফেলটা নামিয়ে ফেলে গোপীন। তারপর একদৃষ্টে

চেয়ে থাকে সে বাঘিনী ও তার শাবকদুটির দিকে। তার দুচোখে ফুটে উঠেছে মুগ্ধ বিস্ময়। সেটা লক্ষ্য করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল দৌলত, আমার কানের কাছে মুখ এনে সে ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, খুব জোর বেঁচে গেলাম আমরা হুজুর!

অস্ফুটস্বরে আমি বললাম, বেঁচে গেল তো ঐ বাঘিনী ও তার বাচ্চাদুটো! আমরা বাঁচব কি না সেটা কি এখনই বলা যায়?

—নিশ্চয়ই বলা যায় হুজুর, বাঘিনী শুধু শুধু আমাদের কিছুই করবে না। কিন্তু ব্যানার্জী সাহেবের রাইফেলের নিশানায় ভুল হলে আমাদের একজনকেও সে বাঁচতে দিত না।

চুপ!—অস্ফুটস্বরে ধমক দিয়ে উঠল গোপীন।

ক্রমশঃ অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তখন, গাছপালা ও ঝোপঝাড়ের ফাঁক-গুলো সব অন্ধকারে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। বাঘিনী ও তার বাচ্চাদুটোকে আর দেখা যাচ্ছে না, অন্ধকারের মধ্যে জ্বল জ্বল করতে থাকে শুধু তাদের তিনজোড়া চোখ।

দৌলত বললে, রাত হলো হুজুর, চলুন এখন আমরা ক্যাম্পে ফিরে যাই।

আমি বললাম, কিন্তু বাঘিনীটা তার বাচ্চাদের নিয়ে এখনো তো রয়েছে এখানে। এই ঝোপ থেকে আমরা বেরিয়ে এলে ওরা আমাদের দেখতে পাবে না?

—দেখতে পেলেও কিছুই করবে না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

অতঃপর বাঘিনী ও তার বাচ্চাদের সামনে দিয়েই হেঁটে চলে এলাম আমরা, আমাদের পায়ের শব্দ শুনেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না তারা।

খার্সোটি নালার ধার থেকে কিছুটা এগিয়ে আসার পর আমি গোপীন'কে বললাম, বাঘিনীটাকে মারলেন না কেন গোপীনদা? নিশানা ভুল হবার ভয় ছিল নাকি?

গোপীন বললে, একটুও না। এমন সহজ নাগালের মধ্যে কোনো বুনো জানোয়ারকে এর আগে পাই নি কখনো। পর পর ওদের তিনটিকেই অনায়াসে মেরে ফেলতে পারতাম।

—তা হলে মারলেন না কেন?

—পারলাম না ভাই। বাঘিনী নিজে না খেয়ে বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছে যত্ন করে—দেখে মন হল মানুষের ঘরেরই একটি মা! আমার শিকারের নেশা থাকলেও এমন পাষণ্ড তো হয়ে যাই নি যে, এমন স্বর্গীয় একটি দৃশ্যকে নষ্ট করে ফেলব!

—এখন আপনার আফসোস হচ্ছে না তো?

না।—গোপীন মৃদু হেসে বললে,—এ পর্যন্ত শিকার করে যত সুখ পেয়েছি, তার চেয়ে অনেক বেশি সুখের স্বাদ পেলাম আজ শিকার না করে।

॥ চার ॥

আমাদের চিরিমিরির ক্যাম্পে কয়লাখনিগুলির চীফ ইনস্পেক্টর এলেন একদিন। তাঁর নাম এখন ঠিক মনে পড়ছে না। বোধ হয় বীরসিং ভাল্লা। তাঁর খুব বাঘ শিকারের শখ। তিনি গোপীনদাকে বললেন, ভাইসাহেব, আমি শের শিকার করতে চাই। যদি বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন খুব ভাল হয়।

গোপীন বললে, বন্দোবস্ত করে দিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু বাঘের কোন খবরই তো নেই।

এমন গভীর জঙ্গলে বাঘের খবর নেই!—বীরসিং অবাক।

—খবর কী করে থাকবে বলুন? আপনার-আমার মত শিকারীদের তৎপরতায় বাঘেরা প্রায় সাবাড় হয়ে এসেছে!

আমি কিন্তু কখনো বাঘ শিকার করি নি!—বীরসিং করুণ চোখে তাকালেন গোপীনের মুখের পানে,—চিতাবাঘ, ব্ল্যাক প্যান্থার এন্তার মেরেছি, কিন্তু বাঘ কখনোই নয়। শুনেছিলাম, এখানকার জঙ্গলে শ'য়ে শ'য়ে বাঘ ঘুরে বেড়ায়, তাদের ভয়ে অন্য কোন জানোয়ার এমুখো হতে চায় না।

গোপীন মৃদু হেসে বললে, ভুল শুনেছেন মিস্টার ভাল্লা। যারা ঘুরে বেড়ায় তারা হচ্ছে মানুষ—কয়লার সন্ধানে বনটাকে তারা চষে ফেলছে। তাদের ভয়ে কোন জানোয়ারই সহজে এমুখো হতে চায় না—বাঘও না।

—বাঘ কি চিরিমিরির আশেপাশে আস্তানা নিয়েছে?

—তা অবশ্য নিয়েছে। চিরিমিরির আশেপাশে বাঘের ডেরা আছে। তার খবরও পাই মাঝে মাঝে।

—এখন কোন খবর নেই?

—দাঁড়ান, খবর নিয়ে দেখি।

গোপীন ডেকে পাঠাল আমাদের গাইড দৌলতরামকে। বাঘ বা চিতাবাঘের খবর এনে দিয়ে সে-ই মাঝে মাঝে গোপীনকে শিকার অভিযানে বেরোবার প্রেরণা জোগায়।

দৌলত আসতেই গোপীন তাকে বললে, দৌলত, ইনি হচ্ছেন আমাদের চীফ ইনস্পেক্টর অব্ মাইনস্, বাঘ শিকার করতে এসেছেন এখানে। বাঘের কোন খবর থাকে তো বল।

খবর তো নেই কোন।—দৌলত মুখ কাঁচুমাচু করে বললে,—চিলখার সেই জোড়াবাঘ ছাড়া আর কোন বাঘের সংবাদ তো পাই নি হুজুর!

চিলখার জোড়াবাঘ!—নিমেষে ঝলসে উঠল বীরসিংয়ের চোখদুটি—কোথায় চিলখা? কত দূর এখান থেকে?

দৌলত বললে, দূর বেশি নয়, কিন্তু ঐ বাঘদুটিকে তো আপনারা শিকার করতে পারবেন না স্যার!

—কেন পারব না? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের নিষেধ আছে?

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের নিষেধ কে মানছে বলুন!—গোপীন মৃদু হেসে বললে,—ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বড়োসাহেব আমার বিশেষ বন্ধু, নিষেধ কিছু থাকলে তাঁকে বলে ম্যানেজ করে নিতে পারি।

—তাহলে আর বাধাটা কোথায়? চলুন আজই জোড়াবাঘের অন্ততঃ একটিকে মেরে নিয়ে আসি।

—অসম্ভব মিস্টার ভাল্লা। ঐ জোড়াবাঘের একটির দিকেও যদি নজর দেন, চিলখার লোকেরা ক্ষেপে গিয়ে হয়তো আপনাকেই শিকার করে বসবে।

চিলখাতে মানুষের বাস আছে নাকি?—বীরসিং অবাক হয়ে তাকালেন গোপীনের মুখের পানে,—বাঘের বাসার কাছে বাস করতে ওদের ভয় করে না?

—একটুও না। বললে বিশ্বাস করবেন না মিস্টার ভাল্লা, বাঘদুটোর কাছাকাছি আছে বলেই ওরা নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে বসবাস করছে।

বলেন কী মিস্টার ব্যানার্জী!—বিস্ফারিত হয়ে উঠল বীরসিংয়ের চোখদুটি,—বাঘের কাছাকাছি কি কেউ নিরাপদে থাকতে পারে?

—পারে না বলেই আমাদের ধারণা। কিন্তু চিলখার লোকেরা বলে যে, বাঘদুটো আছে বলেই ওদের গ্রামে চোর-ডাকাত, চিতা বাঘ, ভালুক ও বুনো শুয়োরের উপদ্রব নেই।

বীরসিং আর কোনও কথা না বলে বিদায় নিলেন আমাদের কাছ থেকে।

সপ্তাহখানেক বাদে দৌলত এসে উত্তেজিত স্বরে বললে, সর্বনাশ হয়েছে স্যার! চিলখার জোড়া বাঘের একটিকে মেরে ফেলেছেন চীফ ইনস্পেক্টর সাহেব!

বল কি!—গোপীন চমকে উঠল,—ভাল্লাসাহেবের বাঘ শিকারের কোন অভিজ্ঞতা তো নেই, অমন দুর্ধর্ষ বাঘ দুটির একটিকে মারতে পারলেন কী করে তিনি?

—বৈকুণ্ঠপুরের রাজবাহাদুর ওঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। জানেন নিশ্চয়ই যে, রাজবাহাদুর খুব পাকা শিকারী, অসংখ্য বাঘ মেরেছেন তিনি সুরগুজা ও কোড়িয়ার জঙ্গলে। তিনি চীফ ইনস্পেক্টর সাহেবকে নিয়ে গিয়েছেন ওখানে, পাহাড়ের তলায় যেখানে বাঘ দুটি নুন চাটে সেখানে গাছের ওপরে মাচান বানিয়ে তার ওপরে গিয়ে বসেছেন স্পটলাইট ও রাইফেল নিয়ে। তারপর—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, বাঘেরা নুন চাটে মানে?

দৌলত বললে, শুধু বাঘেরা কেন, চিতাবাঘ, হাতি, বুনো শুয়োর ইত্যাদি সব রকম জানোয়ারই নুন চাটে। মানুষের মত ওদের শরীরেও নুনের চাহিদা আছে। মাটি যেখানে লোনা সেখানকার মাটি থেকে নুন চেটে নেয় ওরা। চিলখার পাহাড়ের নীচে একটা জায়গা আছে, যেখানে মাটির ওপরে সরের মত নুনের প্রলেপ পড়েছে। বাঘ দুটি রোজ রাতে ওখানে গিয়ে নুন চাটে।

গোপীন বললে, বুনো জানোয়ারদের এই নুন চাটার জায়গাটাকে বলে 'সল্ট লিক'। কিন্তু দৌলত, চিলখার এই 'সল্ট লিক'টাকে খুঁজে বের করলেন কী করে রাজাবাহাদুর ?

দৌলত বললে, আমি আগেই বলেছি স্যার, এদিককার বনজঙ্গল সব রাজবাহাদুরের মুখস্থ। নুন-চাটার জায়গাগুলো শুধু নয়, জানোয়ারদের জল খাবার ঝরনা বা ডোবাগুলোও সব চেনেন তিনি। চিলখার ঐ লোনা মাটির ধারে আগে বহুবার হরিণ শিকার করতে গিয়েছেন তিনি। কাজেই চীফ ইনস্পেক্টর সাহেবকে নিয়ে ওখানে গিয়ে পৌঁছতে তাঁর একটুও অসুবিধে হয় নি।

—চিলখার লোকেরা ওঁদের বাধা দেয় নি ?

—স্বয়ং রাজবাহাদুর গিয়েছেন, তাঁকে বাধা দেবার ক্ষমতা কি ওদের আছে !

—আচ্ছা, কিভাবে বাঘটিকে মারলেন ওঁরা ?

—বাঘটাকে নয়, ওরা মেরেছেন বাঘিনীটাকে। গভীর রাতে বাঘিনীটা বাঘের সংগে এসেছিল নুন চাটতে, যেমন রোজ রাতে আসে। নিশ্চিন্ত মনে জিভ দিয়ে মাটি থেকে নুন চুষে নিচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ জোরালো স্পটলাইট-এর আলো এসে পড়ল ওদের ওপরে। আলোর ফাঁদে আটকা পড়ল বাঘিনীটা, মানে আলোয় ওর চোখ ধাঁধিয়ে গেল আর কি। তারপর বাঘিনীটাকে অনায়াসে তাক করে গুলি করে মারলেন চীফ ইনস্পেক্টর সাহেব।

বাঘটির কী হল ?—আমি উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

দৌলত বললে, বাঘটি তখনকার মত পালিয়ে গেলেও ক্ষেপে উঠল। যে রাতে বাঘিনীটাকে মারা হল, তার পরদিনই সে একটি কাঠুরেকে মেরে ফেলে তার মাংস খেল।

তার মানে বাঘটা মানুষখেকো হয়ে উঠেছে !—গোপীন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে।

—হ্যাঁ হুজুর। এরপর হয়তো নিয়মিত মানুষ মেরে খাবে।

—বাঘ যখন মানুষখেকো হয়ে ওঠে, তখন তো তাকে মেরে ফেলাই উচিত।

দৌলত বললে, তা তো উচিতই। আপনি যদি স্যার বাঘটাকে মারেন···

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে গোপীন বললে, চিলখা গাঁয়ের লোকেরা কী বলে ? বাঘটাকে মেরে ফেলা হোক তা কি চায় ওরা ?

—না হুজুর চায় না। তারা এখনও বাঘটাকে বাঁচিয়ে রাখতেই চায়। গাঁয়ের

প্রধান আমাকে বলছিল, মাত্র একজন মানুষকে মেরে খেয়েছে বলেই বাঘটা স্বভাবে মানুষখেকো হয়ে উঠবে তার কোন কথা নেই। হয়তো ওর আক্রোশটা সাময়িক ঐ কাঠুরেকে মেরে রাগ হয়তো পড়ে গিয়েছে।

—তার মানে আরও কয়েকজন মানুষকে না মারলে বাঘটা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত তারা নেবে না।

—ঠিক তাই হুজুর। কিন্তু আমার মতে অপেক্ষা করাটা রীতিমত মূর্খামি হবে। কারণ যে বাঘ একবার মানুষখেকো হয়েছে, সে চিরকালই মানুষখেকো হয়ে থাকবে।

—তুমি ঠিকই বলেছ দৌলত। কিন্তু চিলখার মানুষদের সহযোগিতা ছাড়া ঐ মানুষখেকো বাঘটাকে মারা কি সম্ভব ?

—তা অবশ্য সম্ভব নয়।

—কাজেই আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। বাঘটাকে মারার প্রস্তাব চিলখার মানুষদের কাছ থেকে আসুক, তার পর আমি যাব।

এক সপ্তাহের মধ্যে চিলখার ঐ বাঘ আরও তিনজন মানুষকে খেল। তিনজনই চিলখার লোক।

পর পর চারজন মানুষকে খেয়েছে ঐ বাঘ। সে যে পুরোপুরি মানুষখেকো হয়ে উঠেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু ঐ বাঘটিকে মারবার জন্য কোন প্রস্তাব এল না চিলখার গ্রামবাসীদের তরফ থেকে।

তারপর মারা পড়ল গ্রামের প্রধান যুগল গোঁড় নিজে। বনের মধ্যে সে তসরের গুটি কুড়োতে গিয়েছিল। তার সংগে ছিল তার স্ত্রী। তসরের গুটি কুড়োতে কুড়োতে তেষ্টা পেয়েছিল যুগলের। সে জল খেতে গিয়েছিল পাহাড়ের নীচে ঝরনার ধারে। সেখানে লতাঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে বাঘটি, তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মেরে ফেলে তার স্ত্রীর চোখের সামনে।

যুগল মারা পড়তেই চিলখার লোকেদের টনক নড়ল। তারা লোক পাঠাল আমাদের ক্যাম্পে।

দৌলত লোকটিকে নিয়ে এল গোপীনের কাছে। গোপীনের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে লোকটি বললে, ঐ বাঘের হাত থেকে আমাদের বাঁচান হুজুর।

সেদিনই গেলাম আমরা চিলখা। সংগে গেল দৌলত।

চিলখাতে পৌঁছলাম বেলা দুটোর সময়ে। ওখানে বন বিভাগের একটি বিশ্রামগৃহ ছিল, আশ্রয় নিলাম সেখানে।

আমরা চিলখাতে গিয়ে পৌঁছতেই আমাদের সংগে দেখা করতে এল যুগলের স্ত্রী।

আমার ও গোপীনের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বললে, তোমরা তো তারা নও, যারা বাঘিনীটাকে শিকার করে বাঘটাকে ক্ষেপিয়ে মানুষখেকো করে তুলেছে!

গোপীন মৃদু হেসে বললে, না, আমরা তারা নই। কিন্তু তাদের দিয়ে কি করতে চাও তুমি?

বাঘের মুখে তুলে দিতে চাই আমি তাদের দুজনকে।—ঝলসে উঠলো যুগলের স্ত্রীর চোখ দুটি,—বাঘটা মানুষখেকো হল, অথচ তাদের মাংসের স্বাদ পেল না, এ আমার সইছে না।

—আমরা বাঘটাকে শিকার করব, পারলে আজ রাত্রেই—

না, না, কক্ষণো না!—যুগলের স্ত্রী চিৎকার করে উঠল,—ওদের দুজন আগে বাঘের পেটে যাক, তারপর মেরো তোমরা ওকে।

ইতিমধ্যে চিলখা গ্রামের প্রায় বারো-চোদ্দজন এসে হাজির হয়েছে আমাদের কাছে, তাদের মধ্যে চার-পাঁচজন মিলে যুগলের স্ত্রীকে একরকম জোর করে বিশ্রাম-গৃহের বাইরে নিয়ে গেল।

চলুন হুজুর, এখনই নিয়ে যাই আপনাদের জঙ্গলের মধ্যে।—একজন মাতব্বর গোছের লোক বললে,—পাহাড়ের নিচে ঝরনার ধারে একটা জাম গাছে মাচান বেঁধে রেখেছি। ওখানে গিয়ে বসলেই বাঘটাকে বাগে আনতে পারবেন, মানে বাঘটা আপনাদের বন্দুকের পাল্লার মধ্যে এসে যাবে। তারপর ঝরনার জল খেতে আসবেই বাঘটা। সন্ধ্যার পর রোজই আসে ওখানে। বাঘটা যুগলকে ওখানেই মেরেছিল, হয়তো তার লাশের খানিকটা এখনও পড়ে আছে ওখানে।

চিলখা গ্রামের চারদিকেই ঘন বন। যেদিক থেকে আমরা এসেছি সেদিকে বনটা একটু পাতলা বলে রাস্তা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এই রাস্তা দিয়েই জীপে করে এসেছি আমরা চিরিমিরি থেকে। তিন দিকে গাছপালা ও লতাঝোপ এমনি নিবিড়ভাবে জড়াজড়ি করে রয়েছে যে, পায়ে-চলা পথেরও আভাস পাওয়া যাচ্ছে না।

গ্রাম থেকে কিছু দূরে একটি পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের একটি গুহার মধ্যেই নাকি বাঘের আস্তানা। পাহাড়টি যেন বনের সবুজ সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপের মত জেগে রয়েছে।

পাহাড়টি লক্ষ্য করে হাঁটতে থাকি আমরা। প্রথমে ঘন ঘাসবনের মধ্যে দিয়ে যেন প্রায় সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে চলি। ঘাসবনের পর শালবন ও লতাঝোপ। আকাশে সূর্য ঝলমল করলেও তার দাহ বনের গাছপালার মধ্যে পরিস্রুত হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

পাহাড়ের তলায় ঝরনা। ঝরনার তলায় জল জমে আছে। যেন একটা

ছোটখাট পুকুর। তার মধ্যে ছোট ছোট মাছ চরে বেড়াচ্ছে। বাঘটা এখানেই মেরেছিল যুগলকে।

ঝরনার আশেপাশে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল দৌলত। মুখ তুলে বারকয়েক গভীর নিঃশ্বাস নিল। তারপর গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বললে, বাঘটা ধারেকাছে আছে বলে বোধ হচ্ছে না।

শীগগির আসুন এদিকে হুজুর!—হঠাৎ আর্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল একজন গোঁড় যুবক। একটা লতাঝোপের আড়ালে কী যেন দেখতে পেয়েছে সে।

কী আছে ওখানে?—আমি রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলাম—বাঘ নয়তো?

বাঘ হলে কি আর লোকটা দাঁড়িয়ে থাকত!—বলে গোপীন এগিয়ে গেল ঝোপটার দিকে। দৌলত এবং আর সকলের সঙ্গে আমিও অনুসরণ করলাম তাকে।

লতাঝোপটি কাছে যেতেই একটা বীভৎস দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল। একটা মানুষের দেহের কিছু অংশ দলা পাকানো অবস্থায় পড়ে আছে। বাঘের ভুক্তাবশেষ। এক ঝাঁক শকুন এসে বসেছে তার ওপরে।

—ঐ যুগল হুজুর।

কী করে চিনলে?—গোপীন প্রশ্ন করল।

—হাতের আঙুল দেখে বুঝলাম হুজুর। অমন লম্বাটে হাতের আঙুল যুগল ছাড়া আর কারুরই হতে পারে না।

ঝরনার সামনে জাম গাছের ওপরে একটা বড় আকারের মাচান বেঁধে রাখা হয়েছে। তাতে পাশাপাশি বসলাম আমরা তিনজন। দৌলত বসেছে স্পট লাইট নিয়ে, আমার ও গোপীনের হাতে আছে একটা করে রাইফেল।

আমারা মাচানে চড়ে বসতেই যারা আমাদের সঙ্গে এসেছিল, তারা ফিরে গেল চিলখায়।

ক্রমশঃ সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে। গাছের মাথায় সোনালী রোদ, তলায় ছায়া। ছায়া ক্রমশঃ ঘন হয়ে আসে। দেখতে দেখতে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে শূন্য স্থানগুলো অন্ধকারে ভরাট হয়ে যায়।

অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা গা-ছম-ছম-করা নৈঃশব্দ নেমে আসে আকাশ থেকে। পাখির ডাকও থেমে যায় হঠাৎ। গাছের ডালে ডালে তাদের ডানার ঝটপটানিও থেমে যায় দেখতে দেখতে।

হঠাৎ এই নিস্তব্ধতার বুক চিরে জেগে ওঠে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। গাছের ডালের গোপন আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসে এক ঝাঁক বাদুড়। নিঃশব্দে উড়ে বেড়ায় তারা বনের মধ্যে।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে থেমে যায় ঝিঁঝিঁ পোকার ঐকতান। সেই সঙ্গে

বাদুড়গুলোও অদৃশ্য হয়ে যায়। কোথায় যায় তারা কে জানে!

এর পর ঝরনার জলের কলতান ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যায় না। বাতাস বইছে না। গাছের তলায় জমে থাকা ঝরা পাতার স্তূপেও কোন শব্দ নেই।

কথা বলা নিষেধ, কাজেই বুকের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা প্রশ্নগুলিকে চেপে রাখি আমি। অনেক কথাই জানতে ইচ্ছে করে আমার। বনের মধ্যে সম্বর, বারশিঙ্গা প্রভৃতি নানা জাতের হরিণ থাকা সত্ত্বেও তারা এদিকে আসছে না কেন? নেকড়ে বা শেয়ালের আনাগোনারও কোন আভাস নেই কেন? তারা কি বনের এই অংশটিকে এড়িয়ে চলতে চায়?

হঠাৎ কী যেন একটা নড়ে উঠল অন্ধকারের মধ্যে। সামনের ঐ লতাঝোপের দিকে এগিয়ে গেল সেই অজানা বস্তুটি। রুদ্ধশ্বাসে তাকাই সে দিকে। আকার বা অবয়ব কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, শুধু একটা নিরাকার গতি।

হঠাৎ জ্বলে উঠল দৌলতের হাতের স্পট লাইটের আলো। তলোয়ারের মতই যেন তা অন্ধকারকে চিরে ফেলল।

একটা হায়েনা। এগিয়ে যাচ্ছে সে বাঘের ঐ উচ্ছিষ্টটির দিকে লেজ গুটিয়ে সতর্কভাবে। স্পট লাইটের আলো তার চোখে পড়ে নি, কাজেই তার গতি ব্যাহত হয় না।

বাঘ বোধ হয় কাছাকাছি নেই।—দৌলত ফিস্‌ফিসিয়ে বললে,—কিংবা কাছে এসেও দূরে সরে গিয়েছে। নইলে এই হায়েনাটি এদিকে আসতে সাহস পেত না।

আলো নিভিয়ে দিল দৌলত। আবার অন্ধকার। হায়েনাটিকে আর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার নড়াচড়া অন্ধকারে ফুটে ওঠে।

লতাঝোপের কাছে এসে হায়েনাটি থামল। তারপর আর কিছু দেখা বা শোনা গেল না। হয়তো নিঃশব্দে খাচ্ছে সে।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল লতাঝোপটি। হায়েনাটি বোধ হয় পালাল। শুকনো পাতার মধ্যে সরসর করে একটা শব্দের স্রোত বইতে শুরু করে। কী একটা ছুটে আসছে এদিকে।

নিশ্চয় বাঘ!

সোজা হয়ে বসি রাইফেলটা তুলে। গোপীনও রাইফেল তোলে।

পর মুহূর্তে জ্বলে উঠল স্পট লাইটের আলো। আলোর ফাঁদে ধরা পড়ল দৌড়ে আসা ছায়ামূর্তিটি। থমকে দাঁড়ায় সে।

বাঘ নয়, একজন মেয়েমানুষ। তার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলাম: এ কি! যুগলের স্ত্রী!

স্পট লাইটের আলো মুখে পড়তেই যুগলের স্ত্রী মুখ তুলে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, তোমরা এখানে! এখনই নেমে এস।

নেমে আসব মানে !—গোপীন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়ে বললে।

—নেমে আসবে মানে নেমে আসবে, বাঘ শিকার করা তোমাদের—

যুগলের স্ত্রীর মুখের কথা মুখেই থেকে যায়, হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে তীরের বেগে যুগলের স্ত্রীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রকাণ্ড বড় একটা বাঘ, স্পট লাইটের আলোয় ঝলমল করে ওঠে তার উজ্জ্বল হলুদ রঙের চামড়া···



সংগে সংগে গর্জে উঠল গোপীনের রাইফেল। চোখের নিমেষে ধরাশায়ী হয় বাঘটি। অচেতন হয়ে যুগলের স্ত্রীও মাটিতে পড়ে যায়।

যুগলের স্ত্রীর গায়েও গুলি লাগে নি তো !—আমি আর্ত স্বরে বলে উঠলাম।

না। –গোপীন বললে,—ও ভয় পেয়ে জ্ঞান হারিয়েছে।

কয়েক সেকেণ্ড মাটির ওপরে গড়াগড়ি খেয়ে বাঘের দেহটা একসময় নিস্পন্দ হয়ে যায়। অব্যর্থ গোপীনের রাইফেলের গুলি, বোধ হয় তা বাঘের হৃৎপিণ্ড ভেদ করেছে।

নেমে পড়লাম আমরা গাছ থেকে। যুগলের স্ত্রীর মুখে-চোখে জলের ঝাপটা দিতেই সে উঠে বসল। তারপর উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, বাঘটাকে মেরে ফেললে তোমরা।

গোপীন বললে, হ্যাঁ, নইলে বাঘটা তোমাকেই খেত।

মুচকি হেসে দৌলত বললে, ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে!

তার মানে?—ভুরু কুঁচকে তাকাল যুগলের স্ত্রী।

—তার মানে তুমি না এলে বাঘটা আসত না এদিকে। তোমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল বলেই না তাকে রাইফেলের নাগালের মধ্যে পেয়ে গেলেন ব্যানার্জী সাহেব।

বাঘটা তাহলে আমার জন্যেই মারা পড়ল—কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে যুগলের স্ত্রী!

একরকম তাই বটে।—মৃদুমন্দ হাসতে থাকে দৌলত।

॥ পাঁচ ॥

বাঘের প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকবে সাদা বাঘের কথা না বললে।

সাদা বাঘ দেখব বলে গিয়েছিলাম গোবিন্দগড়ে। রেওয়া থেকে বারো মাইল দূরে গোবিন্দগড়। সেখানে হ্রদের ধারে কেল্লার আকারে তৈরি রাজপ্রাসাদটি এতই বিশাল যে তার মধ্যে হাজার দুয়েক লোক থাকতে পারে অনায়াসে। রাজপ্রাসাদে অবশ্য রাজা থাকেন না—থাকে একটি সাদা বাঘ, তার বাঘিনী ও শাবকদের নিয়ে। রাজা থাকেন অন্যত্র। কোথায় থাকেন তা অবশ্য জানি না। তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি। দেখা না হলেও তাঁর কাছ থেকে অগ্রিম অনুমতিপত্র আনিয়ে নিতে হয়েছিল সাদা বাঘ দেখার জন্য।

আমি যখনকার কথা বলছি তখন রেওয়ার মহারাজা দেশ-বিদেশে সাদা বাঘের



শাবক বিতরণ করতে শুরু করেন নি। তখন সাদা বাঘ দেখতে হলে মহারাজার বিশেষ অনুমতি নিয়ে আসতে হত এই গোবিন্দগড়ে।

আমার সঙ্গে এসেছিল আমার স্ত্রী। সিধির ডিভিশন্যাল ফরেস্ট অফিসার রমেন ভড়ও ছিলেন আমাদের সঙ্গে। মহারাজার অনুমতিপত্র তিনিই সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।

রাজপ্রাসাদের মাঝামাঝি উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা উঠোনের লাগোয়া একটি বড় লোহার খাঁচার মধ্যে বসে ছিল সাদা বাঘটি। মহারাজা তার নাম রেখেছেন মোহন। সত্যই মোহন তার রূপ। বিপুল আকারের শুভ্র বিস্ময় যেন। সাদা ভেলভেটের মত মসৃণ রোমশ চামড়ার গায়ে কালো চাকা চাকা দাগ। চোখ দুটি যেন আগুনের গোলা। একটা নির্লিপ্ত তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠেছে তার মুখে চোখে।

মোহনের খাঁচার পাশে আর একটি খাঁচার মধ্যে রয়েছে মোহনের বাঘিনী তার চারটি শাবককে নিয়ে। বাঘিনীটির গায়ের রং সাধারণ বাঘের মতই হলুদ। কিন্তু শাবকগুলো মোহনের মতই সাদা।

রমেন ভড় বললেন, এই বাঘিনীটা কিন্তু মোহনেরই মেয়ে। মোহন বড় হবার পর প্রথম যে বাঘিনীটাকে মোহনের খাঁচায় আনা হয়েছিল তার বাচ্চাগুলোর একটিরও গায়ের রং সাদা হয়নি। তারপর একজন জীব বিজ্ঞানীর পরামর্শে ঐ বাচ্চাগুলোর মধ্যে যেটি ছিল বাঘিনী, সেটি বড় হলে পর তাকে এনে রাখা হল মোহনের খাঁচার মধ্যে। তার বাচ্চাগুলো যে সব সাদাই হয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।

ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! আমার স্ত্রী অবাক হয়ে বললে।

নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। মৃদু হেসে বললেন রমেন ভড়, মানে জীববিজ্ঞানীরা তাই বলেন। তাঁদের মতে—

—তাঁদের মতামতের কথা পরে শুনব মিস্টার ভড়। আমার স্ত্রী বাধা দিয়ে বললে এখন বলুন এই মোহনকে কোথায় পেলেন মহারাজা?

—রেওয়া ও সিধির মাঝামাঝি একটি জঙ্গলের মধ্যে। ওখানে উনিশ শো একান্ন সালের মে মাসে একদিন শিকার করতে গিয়েছিলেন মহারাজা। একটা উঁচু গাছের ওপরে মাচা বেঁধে বসেছিলেন তিনি দুজন পেশাদার শিকারীকে সঙ্গে নিয়ে। প্রায় দুশো লোক জঙ্গলটাকে ঘিরে হাঁক-ডাক করতে করতে মোহনকে এনে ফেলেছিল মহারাজার মাচার সামনে। মোহন তখন ন মাসের বাচ্চা। মোহনের সঙ্গে ছিল তার মা ও আরও তিনটে বাঘের বাচ্চা। তাদের গায়ের রং অবশ্য সাধারণ বাঘের মত। মোহনের গায়ের অস্বাভাবিক সাদা রং দেখে আকৃষ্ট হলেন মহারাজা এবং তাকে জ্যান্ত অবস্থায় ধরে ফেলার হুকুম দিলেন।

—তারপর? আমার স্ত্রী রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল।

রমেন বললেন, তারপর ধরা হল তাকে। কিন্তু তাকে ধরার আগে মেরে

ফেলতে হল ঐ বাঘিনী ও তার অন্য তিনটি বাচ্চাকে।

কী নৃশংস! আমার স্ত্রী আঁৎকে উঠে বললে।

নিশ্চয়ই নৃশংস।—মুচকি হেসে বললেন রমেন।—মোহনকে ধরে ফেলাও কম নৃশংস ব্যাপার নয়…

—আচ্ছা ঐ জঙ্গলে আর কোন সাদা বাঘ দেখা যায় নি?

—না। মহারাজা অনেক খুঁজেছেন, আমি নিজেও কম ঘোরাঘুরি করি নি, কিন্তু আর কোন সাদা বাঘ দেখা যায় নি। তবে খোঁজাখুঁজি চলছে এখনও।

—রেওয়ার জঙ্গল ছাড়া আর কোথাও সাদা বাঘ দেখা যায় না?

—এখন আর যায় না, তবে আগে দেখা যেত। উনিশ শো বাইশ সালে কুচবিহারের জঙ্গলে দুটো সাদা বাঘ মারা হয়েছিল। আসামের একটি চাবাগানের কাছে দুটো সাদা বাঘ ঘোরাঘুরি করত—তাদের একটিকে মেরে ফেলেছিল একজন নাগা শিকারী। আরও একটি সাদা বাঘ মারা পড়েছিল কাজি-রাঙার কাছে। একজন শিকারী মেরেছিলেন তাকে। একটি মজার ব্যাপার শুনুন। এই সাদা বাঘটি মারা পড়ার পরে ওখানে বন্যা হয়েছিল এবং সেই বন্যার জলে ডুবে মারা যান ঐ শিকারী। ওখানকার লোকদের ধারণা যে সাদা বাঘটিকে মারা হয়েছিল বলেই প্রকৃতি দেবী রুষ্ট হয়ে শিকারীটির প্রাণ নিয়েছিলেন।

আমি প্রশ্ন করলাম, তেমন কোন কুসংস্কার এখানকার লোকদের মধ্যে নেই তো?

আছে বইকি।—রমেন উত্তর দিলেন।—এই মোহনকে যখন ধরা হল তখন সিধি ও রেওয়ার লোকেরা সব ক্ষেপে উঠেছিল—তারা ভেবেছিল বুঝি সাংঘাতিক-রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটবে—অর্থাৎ বন্যা কিংবা খরা। ক্ষেপে উঠে তারা বৈজনাথকে দিল একঘরে করে। বৈজনাথ মোহনকে ধরে খাঁচায় পুরেছিল। রেওয়া শহরের কাছে পৌড়িতে তার ঘর। পৌড়ি গ্রামের মুখিয়ার মেয়ে পার্বতীর সঙ্গে তার বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়েছিল—সে এক ঘরে হতেই সেই বিয়ে গেল বাতিল হয়ে—

ভারি অন্যায় তো!—আমার স্ত্রী বলে উঠল।

—নিশ্চয়ই অন্যায়। পৌড়ি গ্রামের মুখিয়াকে ডেকে মহারাজা নিজে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে তাঁর কথা কানেও তোলেনি।

—কোথায় আছে ঐ বৈজনাথ?

—যে জঙ্গলে মোহন ধরা পড়েছিল, সেখানে থেকে বন পাহারা দিচ্ছে। ওকে আমি বন-চৌকিদারের চাকরি দিয়েছি। বুঝলেন রায়সাহেব, মোহন ধরা পড়ার পর ঐ জঙ্গলে শিকারীদের আনাগোনা খুব বেড়ে গিয়েছে। বৈজনাথকে আমি তাদের ওপরে নজর রাখতে বলেছি। ঐ শিকারীদের ওপরে নজর রাখতে

গিয়ে সে অবশ্য সাদা বাঘেরও সন্ধান নিচ্ছে।

আমি বললাম, মোহনকে ধরার ফলে যে দুর্যোগের আশংকা করেছিল এখানকার লোকেরা, তেমন কিছু ঘটেছিল কী ?

মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে রমেন বললেন, ঘটেছিল বছর দুয়েক বাদে—সিধির দক্ষিণে কাচনী নদী ফেঁপে-ফুলে উঠে ডুবিয়ে দিয়েছিল সিংরৌলির জঙ্গল।

গোবিন্দগড় থেকে আমরা বেরিয়ে আসতেই আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল একটি বলিষ্ঠ গড়নের যুবক। তার পরনে বন-চৌকিদারের খাকী পোশাক—কাঁধে রাইফেল। তাকে দেখে প্রসন্ন হাসিতে ভরে উঠল রমেনের মুখ। তিনি বললেন, এই হল বৈজনাথ সিং—সাদা বাঘের বনের পাহারাদার। বল বৈজনাথ, শিকারীদের ঠিকমত ঠেকাতে পারছ তো ?

—বৈজনাথ বললে, ঠেকাবার আর দরকার নেই—কারণ বাঘেরা সব পালিয়ে গিয়েছে ঐ জঙ্গল ছেড়ে।

—সাদা বাঘেরাও পালিয়ে গিয়েছে নাকি ?

—আর সব বাঘ পালিয়ে গিয়ে থাকলে পালিয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই।

—কোথায় পালিয়ে গিয়েছে বলতে পার ?

—গিয়েছে তিন্নীর জঙ্গলে। আমাকে ওখানে যাবার হুকুম দিন স্যার। যেখানে বাঘ নেই সেখানে পড়ে থেকে আর কী করব আমি।

কিন্তু তিন্নীর জঙ্গলে তো মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব শুরু হয়েছে।—রমেন বললেন। ওখানকার চার পাঁচজন আদিবাসী বাঘের পেটে গিয়েছে—বন চৌকিদার তো পালিয়েই এসেছে…

—ঐ পালিয়ে আসা বন-চৌকিদারের জায়গা নিতে চাই আমি হুজুর।—গম্ভীর মুখে বললে বৈজনাথ।

তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে বৈজনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে রমেন বললেন, জেনে শুনে মানুষখেকোর খপ্পরে পড়তে চাও তুমি ?

উত্তরে বৈজনাথ একটু কেবল হাসল।

মাসখানেক বাদে একদিন ওয়াইধানের কাছে বনবিভাগের সড়কের ওপরে দেখা হল আমার রমেন ভড়ের সঙ্গে। মাথা-খোলা জীপগাড়িতে করে যাচ্ছিলেন তিনি শোণ নদীর দিকে। আমাকে দেখে গাড়ি থামাতে বললেন ড্রাইভারকে। তারপর গাড়ি থেকে নেমে এসে বললেন, তিন্নীর সেই মানুষখেকো বাঘটা আর একটা মানুষ খেয়েছে—

কাকে খেয়েছে ?—আমি প্রশ্ন করলাম।—আপনার সেই বৈজনাথকে নয় তো ?

—বৈজনাথ নয়, তার শ্বশুরকে !

বৈজনাথের শ্বশুর এল কোথা থেকে!—আমি অবাক হয়ে বললাম।—তার বিয়ে তো বাতিল হয়ে গিয়েছিল বলছিলেন।

রমেন মৃদু হেসে বললেন, বাতিল হলে কী হবে—পার্বতী পালিয়ে এসেছিল বৈজনাথের কাছে। পার্বতীকে নিয়ে নিরাপদে থাকবে বলেই সে আমাকে অনুরোধ করেছিল তাকে তিগ্রীতে বদলি করে দেবার জন্য।

মানুষখেকো বাঘের খপ্পর তার কাছে নিরাপদ জায়গা হল!—বিস্ফারিত হয়ে উঠল আমার চোখ দুটি।

—জামাইখেকো শ্বশুরের তুলনায় মানুষখেকো বাঘটাকেই নিরাপদ বলে বিবেচনা করেছিল। শেষ পর্যন্ত বাঘটাই বাঁচিয়েছে ওকে—ওকে মেরে ফেলার জন্য শ্বশুর ওর ঘরে ঢুকতে যাবে, এমন সময় বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপরে···

—বাঘটা ওকে বা পার্বতীকে ছেড়ে দিয়ে ওর শ্বশুরের ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল!

—লোকে বলে বৈজনাথ তিগ্রীতে গিয়ে বাঘটাকে বশ করে ফেলেছে···

—আশ্চর্য ব্যাপার!

—ব্যাপার যাই হোক, বাঘটাকে বেঁচে থাকতে দেওয়া যায় না, বৈজনাথ একটা মানুষখেকো বাঘের সাহায্যে তার শত্রুদের নাশ করবে তা তো আর আমি হতে দিতে পারি নে।

দিন কয়েক বাদে শুনলাম যে রমেন ভড় তিগ্রীর মানুষখেকো বাঘটিকে শিকার করেছেন এবং তিগ্রী থেকে চলে গিয়েছে বৈজনাথ পার্বতীকে নিয়ে। কোথায় গিয়েছে তা কেউ জানে না।

॥ ছয় ॥

বাঘের চেয়ে হিংস্র প্রাণীর অভাব নেই। সিংহ, গরিলা, কুমীর, গণ্ডার, হাতি ও বুনো কুকুর বাঘের চেয়েও হিংস্র। তবু বন্য প্রাণীদের মধ্যে হিংস্রতম বলে বদনাম আছে বাঘের। বাঘকে পরম শত্রু বলে মনে করে মানুষ। তাকে নির্বিচারে হত্যা করতে দ্বিধা বোধ করেন না শিকারীরা। গাছের ওপরে বাঁধা মাচাং অথবা জীপে বসে স্পটলাইটের আলো দিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে শিকার করার মধ্যে যে কাপুরুষতা আছে, বাঘ শিকারের বেলায় তা স্বীকার করেন না তাঁরা। বাঘ শিকার করতে পারলে তাঁরা গর্ববোধ করেন।

চিত্তলদ্রুগের একজন প্রবীণ শিকারী মোট আড়াইশো বাঘ শিকার করে দেশসুদ্ধ সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। চিত্তলদ্রুগের এই শিকারীর চেয়েও বড় শিকারী ছিলেন জয়পুরের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল। তিনি নাকি মোট এক হাজার বাঘ শিকার করেছেন। বাঘ শিকারীদের মধ্যে শের শাহ শিরোপা পাওয়ার যোগ্য এই শিকারী রাণী এলিজাবেথ ও তার স্বামী ফিলিপের সম্মানার্থে অয়োজিত ভোজসভায় বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। এদের মত আরও অনেক শিকারী আছেন যাঁরা শয়ে শয়ে বাঘ মেরে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

অথচ সত্যিকারের যাঁরা বড়ো শিকারী, যেমন জিন করবেট, তাঁরা এ'দের মত নির্বিচারে বাঘ শিকারের বিরোধী। তাঁরা দেখেছেন যে বাঘ অকারণ হিংসায় স্পৃহাহীন। ক্ষুধা নিবারণের জন্য প্রাণিহত্যা করলেও অন্য প্রাণীদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সে অসহিষ্ণু নয়। মানুষকে সর্বদাই সে এড়িয়ে চলতে চায়।

শিকারীরা অকারণে বাঘের ওপরে হামলা করেন বলেই সে মানুষের বিরুদ্ধে হিংস্র হয়ে ওঠে। জীব মাত্রেরই আত্মরক্ষার প্রবণতা আছে। বাঘের মধ্যেও নিজের প্রাণ বাঁচাবার তাগিদ থাকা অস্বাভাবিক নয়।

প্যাট্রিক হেনলী একটানা ত্রিশ বছর আসামের গভীর অরণ্যে বাস করে বাঘ ও অন্যান্য বন্য প্রাণীদের স্বভাব, জীবনযাত্রা ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি বলেছেন যে জঙ্গলে বুনো জন্তুদের মধ্যে সত্যিকারের ভদ্রলোক হচ্ছে বাঘ। দৈহিক আয়তন ও শক্তিতে যেমন সে বড়, তেমনি মহান সে সহিষ্ণুতায়। অন্য প্রাণীদের সঙ্গে সহাবস্থান নীতিতে সে বিশ্বাসী। রক্তের তৃষ্ণা বা হিংস্রতা তার স্বভাবজাত নয়। সর্বোপরি সে স্বাধীনচেতা। চেষ্টা করলে মানুষ সিংহকেও পোষ মানাতে পারে, কিন্তু বাঘকে কখনোই বাগে আনতে পারে নি। হয়তো এই

জন্যই বাঘের ওপরে মানুষের আক্রোশ। মানুষের বাধ্য নয় বলেই মানুষের কাছে সে বধ্য সর্বদাই।

ইদানীং অবশ্য বাঘকে বাঁচাবার কথা অনেকে চিন্তা করতে শুরু করেছেন। নির্বিচারে হত্যার ফলে এই দেশ থেকে বাঘ ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে উদ্ভব হয়েছে এই চিন্তার। বন্য পশু সংরক্ষণের জন্য স্থাপিত সমিতিগুলি তৎপর হয়েছে এবিষয়ে, তৎপর হয়েছে সরকারী বন বিভাগ।

যারা বনে বাস করে বাঘের সঙ্গে সহাবস্থানে অভ্যস্ত, বাঘকে বাঁচাবার জন্য তাদেরও আগ্রহ রয়েছে। বস্তার জেলায় গভীর জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত একটি গ্রামের আদিবাসীরা জনৈক শিকারীকে বাঘ শিকারে বাধা দিয়েছিল। তারা তাকে বলেছিল যে বাঘেরা আছে বলেই বনের মানুষরা চোরডাকাত ও ছেলে-ধরাদের কবল থেকে নিরাপদে রয়েছে। মানুষের উপদ্রব থেকে বাঁচবার জন্য বাঁচিয়ে রাখতে চায় তারা বনের বাঘদের।

বস্তারের আদিবাসীদের মত অন্যান্য অরণ্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যেও ক্রমশঃ বাঘকে বাঁচাবার জন্য দাবী সোচ্চার হয়ে উঠতে পারে। হয়তো শিগগিরই বাঘের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করবেন শিকারীরা—বাঘকে বাঁচিয়ে রেখে জীবজগতের এক বিস্ময়কর সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখবেন।

॥ সাত ॥

বাঘের মত সিংহকেও বাঁচাবার কথা যখন ভারতীয় বনবিভাগ চিন্তা করতে শুরু করেছেন, তখন গুজরাটের গির-এর অরণ্য ছাড়া আর কোথাও সিংহ নেই। অথচ মধ্য, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বনাঞ্চলে মাত্র একশো বছর আগেও সিংহ বিচরণ করত।

উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতের প্রায় সর্বত্র সিংহ দেখা যেত। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি একজন শিকারী রাজস্থান ও দিল্লীর মাঝামাঝি অঞ্চলে প্রায় তিনশোটি সিংহ শিকার করেছিলেন। তাদের মধ্যে পঞ্চাশটিকে মেরেছিলেন তিনি দিল্লীর কাছেই। অর্থাৎ দিল্লীর মত জনবহুল শহরের কাছেও ছিল তাদের আস্তানা। আরও একজন শিকারী দিল্লীর অদূরে প্রায় আশিটা সিংহ মেরেছিলেন। তিনি নাকি ঘোড়ার পিঠে চেপে ফাঁকা মাঠের মধ্যে তাদের তাড়া করে শিকার করতেন।

শিকারীদের বৃত্তান্ত ছাড়া বিভিন্ন লোককথা মারফতও সিংহের খবর পাওয়া যায়। পুরাণের অনেক গল্পেই সিংহের উল্লেখ আছে। সেই সব গল্প পড়ে মনে হয়, মধ্য, পশ্চিম ও উত্তর ভারতে সর্বত্র সিংহ ছিল। সিংহের প্রাধান্য, বল ও বিক্রম দেখেই আমাদের দেশের মানুষেরা তাকে পশুরাজের মর্যাদা দিয়েছিল।

অনেকের ধারণা যে, পূর্ব ভারতে, বিশেষ করে বাংলাদেশে নাকি সিংহ ছিল না। কিন্তু এই ধারণা যে ভুল তার প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে।

দিলীপ দাশশর্মা ও সুধাংশু বিশ্বাস নামে দুজন তরুণ ভূতাত্ত্বিক সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের নীচে মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করেছে প্রাচীন প্রাণীর দেহাবশেষ বা জীবাশ্ম, যাকে ইংরাজিতে বলে **fossil**। এই সব জীবাশ্ম পরীক্ষা করে তারা নানা রকমের জন্তু-জানোয়ারের হদিস পেয়েছে। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল অতিকায় আকারের হাতি ও সিংহ।

মাটিতে মিশে যাওয়া সিংহের চোয়ালের হাড় ও দাঁত প্রমাণ করেছে যে, বাঁকুড়ার বনে প্রায় বিশ হাজার বছর আগে সিংহ ছিল। কবে এখান থেকে সিংহ লোপ পেল তা অবশ্য জানা নেই। তবে দিলীপ দাশশর্মার অনুমান যে, প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন বাঁকুড়ার সিংহরা বাঁকুড়া ছেড়ে পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছিল।

শিকার-কাহিনী ও পর্যটকদের বৃত্তান্ত পড়ে আমরা আরও জানতে পারি যে, গত শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের জঙ্গলে জঙ্গলে সিংহ দেখা

গেলেও ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের পর গুজরাটের অন্তর্গত 'গির'-এর অরণ্য ছাড়া আর সব জায়গা থেকে সিংহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

দীর্ঘকাল ধরে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সমস্ত উত্তর ভারত জুড়ে যার প্রাধান্য ছিল সে হঠাৎ গুজরাটের একটি বনের মধ্যে কোণঠাসা হয়ে পড়ল কেন, এই প্রশ্ন অনেকের মনের মধ্যেই জেগেছে। প্রশ্নটির জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌রা। তাঁদের মধ্যেই অনেকেই অনুমান করতেন যে, বাঘের খপ্পরে পড়েই সিংহেরা লোপ পেয়েছে। সিংহের অনেক পরে নাকি এদেশের বাঘেদের শুভাগমন ঘটেছিল। তারা এসেছিল উত্তর-পূর্বদিক থেকে। এসেই ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নাকি তারা সংখ্যায় খুব বেড়ে যায়। পশুরাজ সিংহের প্রাধান্য সইতে না পেরে তারা নাকি তাদের সঙ্গে সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হয়। এই ক্ষমতার লড়াইয়ে নাকি সিংহেরা হার মানে।

বাঘের কাছে সিংহের হার মানার ব্যাপারটা এদেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়েছে। আমিও হয়তো তাই বিশ্বাস করতাম যদিনা শিবপুরীর মিশনারী ডাক্তার সিরিল জোন্‌স্‌-এর সঙ্গে আমার আলাপ হত। তাঁর কাছেই জানতে পারি সিংহের আসল শত্রু কে।

তখন আমি ও আমার বন্ধু সুরজিৎ শিবপুরী থেকে দশ মাইল দূরে সুচেতগড়ে ক্যাম্প করে আছি। জায়গাটি মরুভূমির মত। অদূরে চম্বল নদীর গভীর খাত। নদী-খাত যত গভীর হোক, নদীতে জল নেই। নদীর দুপাশের জমি ক্ষয় পেয়ে 'বেহড়ে' পরিণত হয়েছে। গাছপালা দূরের কথা, তাতে এক গাছা ঘাসও গজায় নি।

এই জলহীন মরুক্ষেত্রের মধ্যে ক্যাম্প করে আমরা জলের সন্ধান নিচ্ছিলাম। মাটির ওপরে জলের কোন চিহ্ন নেই, কাজেই মাটির নীচে জলের গোপন ভাণ্ডার খুঁজেছিলাম ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালিয়ে।

কাছাকাছি কোথাও জল নেই, আমাদের ব্যবহারের জন্য জল আনতে হয় শিবপুরী থেকে। খাবার-দাবারও ওখান থেকেই আনাই। তাই রোজই ওখানে জীপ পাঠাতে হয়।

শিবপুরীতে সপ্তাহে দুদিন হাট বসে। হাটের দিনে সুরজিৎ এবং আমিও যাই শিবপুরী শহরে। এই হাটের মধ্যেই আমাদের আলাপ হল সিরিল জোন্‌স্‌-এর সঙ্গে। নব্বই বছরের বৃদ্ধ। কিন্তু বয়সের ভারে নুয়ে পড়েন নি। দিব্যি সচল আছেন এবং কারুর সাহায্য ছাড়াই বাজার-হাট করছেন। আমাদের তিনি নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। স্থানীয় মিশনারী হাসপাতালে তিনি এবং তাঁর ছেলে দুজনেই ডাক্তারি করেন। থাকেন হাসপাতালের লাগোয়া ছোট একটি বাগান বাড়িতে।

আমরা সুচেতগড়ে ক্যাম্প করে জলের সন্ধান নিচ্ছি জেনে রীতিমত খুশী হলেন

ডক্টর জোন্‌স্‌। বললেন, খুবই সৎকাজ করছ তোমরা। জায়গাটিকে যদি বাঁচিয়ে তুলতে পার, তোমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাবে।

ওখানে কখনো গিয়েছেন নাকি আপনি ?—আমি প্রশ্ন করলাম।

—গিয়েছি মানে? রীতিমত বসবাস করেছি! আগে এই হাসপাতাল ওখানেই ছিল।

ঐ নির্জন মরুভূমির মধ্যে হাসপাতাল!—আমার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

তখন ওখানে একটি গ্রাম ছিল,—মৃদু হেসে বললেন ডক্টর জোন্‌স্‌—পুরনো একটা কেল্লাকে কেন্দ্র করে গ্রামটি গড়ে উঠেছিল। গ্রামের চারদিকে ছিল বন।

বলেন কি!—সুরজিৎ অবাক হয়ে তাকাল ডক্টর জোন্‌সের মুখের দিকে,—এখন তো এক গাছা ঘাসও গজায় না!

—গজাবে কিভাবে? সব কিছু ঐ বেহড়ের কুক্ষিগত হয়েছে। প্রায় সত্তর বছর আগে আমি যখন প্রথম ওখানে যাই, তখন ওখানে জলের অভাব ছিল না এবং ওখানকার বনের আচ্ছাদনের দরুন মাটি ক্ষয় হতে শুরু করে নি। ঐ বনের আকর্ষণেই আমার বন্ধু চার্লস বেরী ব্যাপ্টিস্ট মিশনের হয়ে ওখানে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুচেতগড় ছাড়াও আরও কয়েকটি গ্রাম ছিল এই বনের মধ্যে। সেই সব গ্রাম ছাড়া শিবপুরী ও অন্যান্য শহর থেকেও লোকেরা আসত চিকিৎসার জন্য। আমার বন্ধুটি ছিলেন রীতিমত পশুপ্রেমিক, ঐ হাসপাতালে বনের পশুদেরও চিকিৎসা করতেন। শুনেছি, একটি সিংহের পায়ের ক্ষতের চিকিৎসা এই হাসপাতালেই করেছিলেন তিনি।

ওখানে সিংহ ছিল নাকি ?—আমি অবাক হয়ে বললাম।

—হ্যাঁ, ছিল। আর সিংহ ছিল বলেই আফ্রিকার জঙ্গল থেকে আমি এসেছিলাম আমার বন্ধুর কাছে—ওখানকার সিংহই ওখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে।

বলেন কি! সুরজিৎ বিস্মিত।

একটু থেমে ডক্টর জোন্‌স্‌ বলতে শুরু করলেন ঃ

প্রথম যৌবনে আমি ছিলাম একজন পেশাদার শিকারী। আফ্রিকাতে কেনিয়ার একটি বড়ো খামারের মালিক আমাকে মোটা মাইনে দিয়ে নিযুক্ত করেছিলেন বন্য জন্তুদের উপদ্রব থেকে খামারের অধিবাসিদের বাঁচাবার জন্য। বন্য জন্তুদের মধ্যে সিংহেরই ছিল প্রাধান্য। পালে পালে সিংহ খামারের এলাকার মধ্যে চরে বেড়াত, চলে আসত লোকালয়ের মধ্যে। মানুষের চোখে সিংহ হিংস্র জীব। খামারে যারা কাজকর্ম করত তাদেরও তাই ধারণা ছিল, যদিও মানুষের ওপরে সিংহের হামলা করার ঘটনা ওখানে কদাচিৎ ঘটেছে। খামারের গরু, ভেড়া

মোষ বা ঘোড়ার ওপরেও তারা বড় একটা আক্রমণ চালাত না কারণ ওখানে হরিণ, জেব্রা ও বুনো শুয়োরের অভাব ছিল না। তবু সিংহ দেখলেই সকলে ভয় পেত। খামারের মালিক আমাকে নির্বিচারে সিংহ-হত্যার হুকুম দিয়েছিলেন। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম! কাজেই ঘোড়ার পিঠে চেপে খামার ও তার আশেপাশে ঘাসবনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সিংহ মারতে শুরু করলাম। আমার সঙ্গে থাকত দুজন আফ্রিকান গাইড।

জানো নিশ্চয়ই যে, শিকার একটা সাংঘাতিক নেশা। বাঘ বা সিংহের মত জানোয়ার শিকার করার নেশা আরও তীব্র হয়ে থাকে। একটা বড়ো আকারের দুর্জয় পরাক্রমশালী সিংহ যখন আমার বুলেটবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গজরাতে থাকত, তখন এক অনাবিল সুখ আমার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলত। একে একে প্রায় চারশোটা সিংহ মেরে ফেললাম, খামারের এলাকায় আমার ভয়ে সিংহরা আর আসতেই চায় না, কাজেই খামারের এলাকার বাইরে ঘুরে ঘুরে শিকার করি। তখন প্রায়ই ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে শিকারীর দল শিকারের অভিযানে কেনিয়ায় আসতেন, ঘুরে বেড়াই তাঁদের সঙ্গেও। বিদেশী শিকারী-মহলে সিংহ-শিকারী হিসেবে আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল, কাজেই সিংহ শিকারে সকলেই আমার সাহায্য নিতেন। একবার ভারত থেকে কোন একটি ছোট করদরাজ্যে রাজা কেনিয়াতে গিয়েছিলেন, তিনিও সাহায্য নিয়েছিলেন আমার এবং আমার সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে চেপে গুটি পাঁচেক সিংহও মেরেছিলেন। এই রাজাসাহেবের কাছ থেকেই আমি প্রথম ভারতীয় সিংহের কথা শুনি। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, ভারতীয় সিংহ আফ্রিকার সিংহের চেয়েও তেজী। আকারে আফ্রিকার সিংহের তুলনায় বড় না হলেও অনেক বেশি মোটাসোটা। ভারতীয় সিংহের কথা শুনতে শুনতে আমার ভারতে গিয়ে সিংহ শিকারের ইচ্ছে হল। আমার এই বাসনার কথা শুনে রাজাসাহেব মৃদু হেসে বললেন যে, গুজরাটের গির-এর সংরক্ষিত বনের বাইরে সিংহ নেই বললেই চলে, কাজেই ভারতে গিয়ে সিংহ শিকার সম্ভব নয়। ভারতে গিয়ে সিংহ শিকারের বাসনাটাকে মন থেকে যখন প্রায় মুছে ফেলতে বসেছি, তখন হঠাৎ চিঠি পেলাম চার্লস বেরীর কাছ থেকে। তিনি আমাকে লিখলেন যে, সুচেতগড়ের চারপাশে সুন্দর একটা জংগল আছে আর সেই জংগলে চিতাবাঘ, চিতল, বারশিংগা, বুনো শুয়োর প্রভৃতি নানারকম জন্তু-জানোয়ারের সংগে গোটা দুয়েক সিংহও আছে—অনেক কষ্টে তাদের তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন। চার্লস বেরীর চিঠির উত্তরে তাঁর ওখানে আমার যাবার বাসনার কথা ব্যক্ত করতেই তিনি লিখলেন যে, আমি যেতে পারি, কিন্তু ওখানে শিকার করতে আমাকে তিনি দেবেন না।

খামারের মালিকের কাছ থেকে দু মাসের ছুটি নিয়ে রওনা হলাম আমি

সুচেতগড়ে। চার্ল'স বেরী লিখেছিলেন যে, গোয়ালিয়র হয়ে আমাকে সুচেতগড়ে যেতে হবে তাই বোম্বাই থেকে গোয়ালিয়রের টিকিট কিনেছিলাম। গোয়ালিয়র স্টেশনে পৌঁছাতেই আমাকে অভ্যর্থনা জানাল বেরীর হাসপাতালের একজন কর্মী নাম তার সুমের সিং। সুমের সিং বললে যে, ডক্টর বেরী আমার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। গাড়ি বলতে টাঙ্গা। সেই টাঙ্গায় করে পৌঁছতে আমাদের রাত হয়ে গেল।

সুচেতগড়ে ডক্টর বেরীর বাংলোতে নিয়ে গেল আমাকে সুমের সিং। হাসপাতালের পাশেই ছিল বাংলোটা। বাংলোতে অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে সুমের সিং খানসামাকে ডেকে বলল আমার স্নানের জন্য গরম জল দিতে এবং বাবুর্চীকে চটপট ডিনার তৈরী করে ফেলতে হুকুম দিল।

অতিথি সৎকারে কোন ত্রুটি ছিল না, কিন্তু যাঁর হয়ে সুমের সিং আমার আদর-আপ্যায়ন করছিল, তাঁর দেখা পেলাম না। ভাবলাম, রুগী দেখতে হয়ত দূরে কোথাও গেছেন ডক্টর বেরী।

ডিনার শেষ করে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে আসছি, সুমের সিং জানাল যে, আমার ঘরে বিছানা পেতে রেখেছে সে, ইচ্ছে করলে আমি শুয়ে পড়তে পারি।

ডক্টর বেরীর সঙ্গে দেখা না করেই শুয়ে পড়ব!—আমি অবাক হয়ে তাকালাম সুমের সিংয়ের মুখের পানে ঃ তাঁর ফিরতে কি রাত হবে অনেক?

শোনামাত্র দারুণভাবে চমকে ওঠে সুমের সিং, পরক্ষণেই বিবর্ণ হয়ে যায় তার মুখ। কাঁপা গলায় সে বললে, আর কখনোই তিনি ফিরবেন না মিস্টার জোন্‌স্!

কোথায় গিয়েছেন তিনি?—রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করি।

এবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সুমের সিং। মিনিট খানেকের মধ্যেই অবশ্য নিজেকে সামলে নিল সে। রুদ্ধস্বরে বললে, ভগবান তাঁকে টেনে নিয়েছেন মিস্টার জোন্‌স্!

—অ্যাঁ!! কী হয়েছিল তাঁর?

—হার্ট অ্যাটাক। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল! মৃত্যুর আগে শুধু বলে গেলেন আমরা যেন আপনার আদর-আপ্যায়নে কোন ত্রুটি না রাখি।

এর পর আমি আর কোন কথা বলতে পারলাম না। বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। চার্ল'স বেরী আমার বাল্যবন্ধু ছিলেন—একসঙ্গে আমরা স্কুলে পড়েছি।

সুচেত সিং আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন চলে গেল, তখন প্রায় মাঝরাত। পথের ধকলে আমার শরীর মন দুই-ই শ্রান্ত, কিন্তু চোখে ঘুম আসছে না। একটা চুরুট ধরিয়ে বসে থাকি আমি আমার ঘরের লাগোয়া বারান্দায়।

বারান্দার সামনে ফুলের বাগান—তারপর শুরু হয়েছে বন। তখন কৃষ্ণপক্ষের

একফালি চাঁদ উঠেছে আকাশে। ফিকে জ্যোৎস্নায় বনের আবছা আভাস। ছোট ছোট গাছ ও লতাঝোপের ফাঁকে ফাঁকে ঘাসের আচ্ছাদন। কিছু দূরে জ্যোৎস্নায় চিক চিক করছে চম্বলের ক্ষীণ জলস্রোত। চারদিক নিস্তব্ধ।

কতক্ষণ বসে ছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ চমকে উঠলাম। বাগানের মেহেন্দীলতার বেড়াটা নড়ে উঠল না!

বাতাস বইছে না, অথচ লতাঝোপটা কেঁপে কেঁপে উঠছে! বড়ো আকারের কি একটা যেন লতাঝোপের মধ্যে ঢুকেছে।

পাশেই ছিল আমার রাইফেলটা, আমি তুলে নিলাম।

রুদ্ধশ্বাসে বসে আছি। সহসা লতাঝোপ ভেদ করে বেরিয়ে এল একজোড়া সিংহ। এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে তারা। নীল রঙের আগুনের গোলার মত জ্বলজ্বল করছে তাদের দুজোড়া চোখ।

ওরা বোধ হয় দেখতে পেয়েছে আমাকে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে।

রাইফেলের সেফটি ক্যাচ খুলে ফেলি। একসঙ্গে দুটোকে গুলি করে মারা সম্ভব নয়। পর পর দুটো গুলি করার সুযোগ পাব কিনা জানি না। একটিকে গুলি করামাত্র অন্যটি নিশ্চয়ই লাফিয়ে পড়বে আমার ওপর। তখন অন্যটিকে গুলি করে মারা সম্ভব হবে না। এই পরিস্থিতিতে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া। তা-ই করলাম। ঘরের দরজার পাশে জানালা আছে—সেটাও দিলাম বন্ধ করে।

দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। রাইফেলটা হাত থেকে নামাই না—সিংহদুটি দরজা ভেঙেগ ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করতে পারে।

কিন্তু দরজা ভেঙেগ সিংহদুটি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লে গুলি করার সুযোগ আর পাব কি? একজোড়া সিংহের সঙেগ মুখোমুখি লড়া স্বয়ং হারকিউলিস-এর পক্ষেও বোধহয় অসম্ভব। কাজেই সিংহদুটি আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেবার আগেই ওদের মেরে ফেলতে হবে আমাকে। কিন্তু ঘরের মধ্যে থেকে কিভাবে ওদের মারব? ভাবতে ভাবতে দরজার পাশের জানালার দিকে আমার নজর পড়ে। জানালায় লোহার জাল বসানো আছে। যত শক্তিশালীই হোক লোহার জাল ভাঙগতে সিংহদুটির সময় লাগবে। কাজেই জালের আড়াল থেকে গুলি চালাতে আমার কোন অসুবিধা হবে না—আমার নাগাল পাওয়ার আগেই ওরা গুলিবিদ্ধ হবে।

পরিকল্পনা মত জানালাটা খুলে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু কই, বাইরে সিংহ দুটিকে তো দেখা যাচ্ছে না। বাগানের মধ্যেও কোথাও নেই তারা। মেহেন্দীর বেড়া ও পাশের ঘাসবনের মধ্যেও কোনরকম স্পন্দন চোখে পড়ছে না। সিংহ দূরের কথা, ছোটখাট একটা খরগোশও কোথাও লুকিয়ে আছে বলে মনে হল না।

পালিয়ে যাক বা লুকিয়ে থাকুক, আপাতত সিংহদুটো আমার চোখের সামনে নেই। কাজেই শুয়ে পড়লাম।

ঘুমোবার মত মনের অবস্থা আমার তখন নয়, কিন্তু দেহের ক্লান্তির দরুন শোওয়ামাত্র আমার ঘুম এসে গেল।



ঘুম এলো, কিন্তু একটা দুঃস্বপ্ন জাগিয়ে দিল আমাকে। ধড়মড় করে উঠে

বসলাম আমি। চোখ রগড়ে সামনের দিকে তাকাতেই—

সুরজিৎ বাধা দিয়ে বললে, কিন্তু কী দুঃস্বপ্ন দেখলেন ?

—দেখলাম চার্লস বেরীকে। তিনি যেন নাইট গাউন পরে আমার ঘরে ঢুকছেন আর তাঁর পেছনে পেছনে আসছে একজোড়া সিংহ। তাঁকে অনুসরণ করে সিংহদুটিও ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে যায় আমার ঘুম। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গতেই আমার সেই দুঃস্বপ্নকেই যেন আমার চোখের সামনে জীবন্ত রূপ নিতে দেখলাম !

তার মানে।—সুরজিৎ হতবুদ্ধির মত তাকালো ডক্টর জোন্‌স্ এর মুখের পানে।

—তার মানে জানালার মধ্য দিয়ে সত্যিই একটা সিংহকে দেখতে পেলাম। প্রকাণ্ড তার আকার—সুপুষ্ট কেশর, চোখদুটি যেন দুটো নীল রঙের আগুনের গোলা। প্রথমে ভাবলাম, বুঝি ভুল দেখছি। বিছানার ওপরে উঠে বসে চোখ ভাল করে রগড়ে আবার তাকাই জানালার দিকে। এবারে সিংহের পাশে সিংহীটিকেও দেখতে পেলাম। দুজনে বারান্দায় উঠে জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বুঝলাম, ওদের মতলব ভল নয়। আমি যখন বারান্দায় বসে ছিলাম তখনই ওরা আমাকে আক্রমণ করার জন্য বাগানে ঢুকে বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছিল, আমি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতেই ওরা চলে যায়। তারপর আবার ওরা এসেছে। ঘরের মধ্যে ঢোকার মতলবেই নিশ্চয়ই বারান্দায় উঠে এসেছে। জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে হয়তো জানালা দিয়ে ঢোকবার চেষ্টায়।

উঠে দাঁড়িয়ে রাইফেলটা তুলে ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল চার্লস বেরীর নিষেধের কথা। তিনি লিখেছিলেন যে, সিংহ শিকারের মতলব আমার মনের মধ্যে থাকলে আমাকে তিনি সুচেতগড়ের ধারেকাছেও ঘেঁষতে দেবেন না। বোধ হয় এই সিংহদুটির কথা মনে করেই ওকথা লিখেছিলেন। হয়তো তাঁরা সতর্কতার দরুনই সিংহদুটির গায়ে এতকাল কেউ আঁচড় লাগাতেও পারে নি। কিন্তু যাদের তিনি বাঁচাতে চেয়েছিলেন, তারা মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠলে তাদের নিশ্চয়ই বাঁচতে দেওয়া চলে না। সিংহদুটি তাঁর ওপরে হামলা করতে এলে তিনি নিশ্চয়ই তাদের মেরে ফেলতেন।

অতএব বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে রাইফেলটা নিয়ে চলে এলাম জানালার ধারে। মৃদু জ্যোৎস্নায় বারান্দা ভরে গিয়েছে। সিংহদুটিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ওরা এগিয়ে এসেছে জানালার ধারে। একটু নীচু হয়ে দাঁড়িয়েছে, চোখের দীপ্তি দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে—বুঝি ঝাঁপ দেওয়ার পূর্বলক্ষণ ! সিংহের দেহের শক্তি বাঘের চেয়ে কম নয়, ঝাঁপ দিয়ে লোহার জালটিকে ভেঙ্গে ফেলতেও পারে। আর এক মুহূর্তও দেরি করা চলে না। রাইফেলের সেফটি কাচ খুলে ফেলে সিংহটির

হৃৎপিণ্ড তাক করে গুলি করলাম। গুলিবিদ্ধ সিংহটি প্রচণ্ড গর্জন করে লুটিয়ে পড়ল বারান্দার ওপরে।

রাইফেলের গুলির শব্দে সিংহীটি সোজা হয়ে দাঁড়ায়। সে বোধ হয় বুঝতেই পারে না কী ঘটেছে। মাটিতে লুটিয়ে পড়া রক্তাক্ত সিংহটির দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যায় তার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সিংহীটির মাথা লক্ষ্য করে গুলি করলাম আমি। মাথায় গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সিংহীটি—নিমেষে নিস্পন্দ হয়ে যায় তার দেহ। এক গুলিতেই সে ঘায়েল হয়েছে। কিন্তু সিংহটা তখনও ছটফট করছে। তাকে শেষ করে ফেলতে আরও দুটি গুলি খরচ করতে হল আমাকে।

রাইফেলের গুলির আওয়াজ ও সিংহের গর্জন শুনে ছুটে এল সুমের সিং ও আরও অনেকে। আমিও ততক্ষণে বারন্দায় বেরিয়ে এসেছি।

এ কি করেছেন হুজুর!—সিংহদুটির মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে আর্তনাদ করে উঠল সুমের সিং—ডাক্তার সাহেব এদের পোষা সিংহের মত আগলে রেখেছিলেন, শিকারীদের নজর যাতে এদের ওপরে না পড়ে তার জন্য সর্বদাই সতর্ক থাকতেন। এদের আপনি মেরে ফেললেন স্যার!

নিজের জান বাঁচাবার জন্যই মেরেছি ওদের মিস্টার সিং—আমি জবাব দিলাম, —ওরা আমার উপরে হামলা করার জন্য বারান্দায় উঠে এসে জানালার পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমি গুলি করতে আর একটু দেরি করলে ওরা জানালার জাল ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ত!

—আপনি ভুল করেছেন মিস্টার জোন্‌স্, ওরা আপনার ওপর হামলা করার জন্য বারান্দায় উঠে আসে নি। হয়তো আপনি যখন বারান্দায় বসে ছিলেন, তখন ওরা বনের মধ্যে থেকে আপনাকে দেখে আপনাকে ডক্টর বেরী বলে ভুল করেছে। ওরা তো আর বোঝে না যে ডক্টর বেরী আর বেঁচে নেই, তাই ওঁকে দেখবে বলে উঠে এসেছে বারান্দার ওপরে, দাঁড়িয়েছে জানালা ঘেঁষে। কিন্তু আপনি এ কী করলেন মিস্টার জোন্‌স্!

বলতে বলতে রুদ্ধ হয়ে আসে সুমের সিং-এর গলার স্বর।

এ পর্যন্ত বলে থামলেন ডক্টর জোন্‌স্।

তারপর?—সুরজিৎ উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

তারপর শুরু করলাম আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত,—ডক্টর জোন্‌স্ ম্লান হেসে বললেন,—প্রতিজ্ঞা করলাম যে, বনের বাকি সিংহগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করব। কিন্তু বনের মধ্যে আর সিংহ ছিল না। তখন বুঝলাম যে, ঐ সিংহ দু'টিই ছিল বনের শেষ সিংহ। অন্যান্য বনে সন্ধান নিয়ে জানলাম যে, গুজরাটের গির-এর জঙ্গল ছাড়া আর সব জঙ্গল থেকে সিংহ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। গির-এর জঙ্গলে সিংহ সংরক্ষণের দায়িত্ব গভর্নমেন্টই নিয়েছে—সেখানে আমার কিছুই করার ছিল

না। সিংহকে বাঁচাবার জন্য কিছুই করতে না পেরে আমি সুচেতগড়ের হাসপাতালের দিকে মন দিলাম। বোম্বাইয়ের মেডিকেল স্কুল থেকে ডাক্তারি পাশ করে এসে হাসপাতালের পুরো দায়িত্ব নিলাম আমি।

সুরজিৎ বললে, গির ছাড়া এদেশের আর সব বন থেকে সিংহ নিশ্চিহ্ন হল কেন বলতে পারেন? শুনেছি তার জন্য বাঘ দায়ী।

ভুল শুনেছ।—ডক্টর জোন্‌স্‌ বললেন, বাঘ ও সিংহ পাশাপাশি একই বনে কদাচিৎ থেকেছে। বাঘ থেকেছে বড় বড় গাছের ঘন বনের মধ্যে, আর সিংহ বেছে নিয়েছে ছোট ছোট গাছের পাতলা জঙ্গল। কখনো কখনো হয়তো মুখোমুখি হয়েছে তারা, কিন্তু মুখোমুখি হয়েও লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ দৈহিক শক্তিতে দুজনেই সমান—ক্ষমতার লড়াইয়ে কেউ কাউকে হারিয়ে দেবার আশা রাখতে পারে না। কাজেই আমি যতদূর জানি, সিংহ ও বাঘ পরস্পর পরস্পরকে চিরকালই এড়িয়ে চলেছে।

—তাহলে সিংহরা লোপ পেল কি করে?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ডক্টর জোন্‌স্‌ বললেন, সিংহের আসল শত্রু বাঘ নয়, মানুষ। গির-এর সংরক্ষিত বনের মধ্যে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হলে তাদের মানুষের হাত থেকেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

॥ আট ॥

গুজরাটের 'গির' অরণ্যে সিংহ দেখতে গিয়ে সিংহের চেয়ে হিংস্র প্রাণীর দেখা পেয়েছিলেন বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ ই. পি. গী.। তার সঙ্গে আমার ভূতাত্ত্বিক বন্ধু সুরজিৎ গুহেরও সাক্ষাৎকার ঘটেছিল।

জন্তুটি কী জানবার জন্য নিশ্চয়ই দারুন কৌতুহল হচ্ছে তোমাদের। তার পরিচয় পাওয়া মাত্র হয়তো তাকে দেখতে যাবে ভাবছ।

কিন্তু জন্তুটির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে সিংহকে চেনা দরকার। এস আমরা 'গির'-এর বনে গিয়ে সিংহ-মশায়ের সঙ্গে আলাপ করে আসি।

আমার ভূতাত্ত্বিক বন্ধু সুরজিৎ গুহের সঙ্গে যাব আমরা। সুরজিৎ গির-এর অরণ্য-অঞ্চলে জলের সন্ধানে যাচ্ছে। ওখানকার সিংহরা জলের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে বড়। বনে জলকষ্টের দরুন তারা লোকালয়ের কাছাকাছি চলে আসছে এবং ত্রাসের সঞ্চার করছে ওখানকার মানুষদের মনে। মানুষের উপরে হামলা না করলেও গৃহপালিত পশুদের উপরে নজর দিচ্ছে—মাঝে মাঝে গরু-মহিষ মেরে খেয়ে ফেলছে।

যতই উপদ্রব করুক, সিংহকে মারা চলবে না। এদেশে একমাত্র গির-এর বনাঞ্চলে মাত্র শ'তিনেক সিংহ অবশিষ্ট অছে। সরকারী বন-বিভাগ থেকে শুরু করে স্থানীয় বনবাসী পর্যন্ত সকলেই তাদের বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কাজেই বনের মধ্যে জল খুঁজে বের করে সিংহগুলোকে বনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কথা চিন্তা করেন বন-বিভাগের বড়কর্তারা। তাঁরা ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগকে গির-এর বনের মধ্যে জলের জন্য সমীক্ষা চালাবার জন্য অনুরোধ করলেন। বন-বিভাগের কর্তৃপক্ষের অনুরোধ মেনে নিয়ে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগের অধিকর্তা সুরজিৎকে এ কাজের দায়িত্ব দিলেন। সুরজিৎকে বললেন, গির-এর অরণ্য পরিক্রমা করে মাটির কত নীচে জল আছে তার পরিমাপ করতে। জলের স্তর যেখানে যেখানে অগভীর সেখানে পুকুর খোঁড়ার পরিকল্পনা করা হল।

পুকুর খুঁড়লে তার জলের আকর্ষণে শুধু সিংহ নয়, হরিণ, সম্বর ও বুনো শুয়োরদেরও সমাগম ঘটবে বনের মধ্যে। জলের ছোঁয়া লেগে বনের ঘাসগুলো নতুন জীবন পাবে—হরিণ, সম্বর বা বুনো শুয়োরদের আর খাদ্যাভাবে কষ্ট পেতে হবে না। খাদ্যাভাবে সিংহদেরও ভুগতে হবে না—কারণ ইচ্ছে ও রুচিমত তারা হরিণ বা সম্বর বা বুনো শুয়োর শিকার করে খাবে। ক্ষুধার অন্ন বনের মধ্যেই

পেয়ে গিয়ে বনের বাইরে তারা আসবে না—গৃহপালিত গরু-মোষগুলির দিকেও আর নজর দেবে না।

অতএব সুরজিৎকে তাড়া দেওয়া হল তাড়াতাড়ি গির-এর অরণ্যের গোপন জলের ভাণ্ডার খুঁজে বের করার জন্য।

চলে এল সুরজিৎ জুনাগড়ে। গুজরাটের মধ্যে সৌরাষ্ট্র বা কাথিয়াওয়াড় বিভাগ পশ্চিমে আরব সাগরের মধ্যে একটা উপদ্বীপের আকারে বেরিয়ে আছে। জুনাগড় তারই অন্তর্গত একটি শহর। জুনাগড় থেকে জীপে করে রওনা হল সুরজিৎ। গির-এর বনের সীমানায় পৌঁছতেই বন-বিভাগের কর্মচারীরা তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন।

তখন ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ—বনের মধ্যে পাতাঝরার পালা শুরু হয়েছে। প্রায় পাঁচশো বর্গমাইল জোড়া বন জুড়ে ছোট ছোট বাবলা, সেগুন ও পলাশগাছ প্রায় পাতাশূন্য হয়ে পড়েছে। গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ঘাসের আচ্ছাদনও শুকিয়ে হলুদ হয়ে গিয়েছে। পাতা ঝরে গেলেও পলাশের ডালে ডালে পলাশফুল ফুটেছে। বনময় এই লাল ফুলের সমারোহে দেখে মনে হচ্ছে যেন বনের মধ্যে আগুন লেগেছে।

বনবিভাগের বিশ্রামগৃহে বসে বনের শোভা দেখে সুরজিৎ আর ফরেস্ট রেঞ্জার পুরুষোত্তম পাণ্ডেল-এর কাছে গির-এর বনের সিংহের গল্প শোনে। এদেশের আর সব বন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে গির-এর বনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েই সিংহরা দেশ ও বিদেশের মানুষদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং সকলেই তৎপর হয়ে উঠলেন তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জের দাদা ডিউক অব ক্লারেন্স গির-এর বনে এসেও সিংহ শিকার করেন নি। শিকারের নেশা তাঁর যতই প্রবল হোক, গির-এর সিংহদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনিও ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

গির-এর সিংহদের বাঁচাবার জন্য লর্ড কার্জনও তৎপর হয়েছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে জুনাগড়ের নবাবের শিকার-অভিযানের আক্রমণ প্রত্যাখ্যান করে তাঁকে তিনি সিংহদের রক্ষণাবেক্ষণে মন দিতে বলেছিলেন।

গির-এর সিংহদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা চলছে একটানা প্রায় আশি বছর ধরে। ইতিমধ্যে শিকারীরা গোপনে বনের মধ্যে ঢুকে সিংহ শিকার করার চেষ্টা করেনি তা নয়। কিন্তু তারা ধরা পড়ে গিয়ে স্থানীয় বনবাসীদের কাছে নাস্তানাবুদ হয়েছে।

গির-এর বনবাসিরা সিংহকে প্রতিবেশী বলে মেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করছে প্রায় একশো বছর ধরে। সিংহের পাশাপাশি মানুষের এমন

অহিংস অবস্থানের দৃষ্টান্ত আফ্রিকার জঙ্গলেও পাওয়া যাবে না। সিংহ প্রায়ই লোকালয়ের কাছাকাছি এসে গিয়ে ক্ষুধার তাড়নায় গৃহপালিত পশুদের ওপরে হামলা করেছে, কিন্তু মানুষকে কখনোও আক্রমণ করেনি। গির-এর বনে মানুষ-খেকো সিংহের কথা কদাচিৎ শোনা গিয়েছে। ওখানকার সিংহের হাবভাব দেখে মনে হয় মানুষের সঙ্গে অনাক্রমণের চুক্তিতে তারা আবদ্ধ এবং সেই চুক্তি মেনে চলতে তারা বদ্ধপরিকর।

পুরুষোত্তম পাণ্ডেলের কাছে গির-এর সিংহের গল্প শুনতে শুনতে সুরজিৎ মুগ্ধ হল। সে পুরুষোত্তমকে বললে, এখানকার সিংহকে আমি খুব কাছ থেকে দেখতে চাই পুরুষোত্তমবাবু—আপনি ব্যবস্থা করে দিন।

পুরুষোত্তম বললেন, এখানকার বনে যখন কাজ করতে এসেছেন, দেখা পাবেন নিশ্চয়ই। তবে খুব কাছে থেকে দেখা পাওয়াটা কঠিন। তার সুযোগ কদাচিৎ ঘটে।

পরদিন ভোরে পুরুষোত্তমের সঙ্গে বন পর্যটনে বেরোলো সুরজিৎ। শুকিয়ে যাওয়া ঘাসবনের মধ্যে দ্বীপের মত জেগে রয়েছে বেঁটে আকারের পাতাঝরা গাছগুলো। তাদের মধ্যে লাল রঙের পলাশফুল যেন আগুনের মত ফুটে আছে।

ঘোরাঘুরি করতে একটা নালার ধারে গিয়ে পৌঁছাল তারা। নালাতে জল নেই এক ফোঁটাও, কিন্তু শুকনো বালি ও নুড়ির ওপরে জলের স্রোতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। সুরজিৎ পুরুষোত্তমকে বললে, বালি খুঁড়ে দেখতে হবে—আমার মনে হচ্ছে বালির নীচে জল আছে।

পুরুষোত্তম বললে, তা থাকতে পারে—কারণ, কাছেই একটা জলের প্রস্রবণ আছে। যতদূর জানি, প্রস্রবণটা কখনো শুকোয় না।

কোথায় এই প্রস্রবণ ?—সুরজিৎ প্রশ্ন করল।

—কাছেই। চলুন আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

পুরুষোত্তমকে অনুসরণ করে হাঁটতে থাকে সুরজিৎ। নালার ধার দিয়ে একটা টিলাকে লক্ষ্য করে চলেছে তারা।

প্রায় আধ মাইল হেঁটেছে তারা, এমন সময় টিলার দিক থেকে ছুটতে ছুটতে এল তিনজন ফরেস্ট গার্ড—তারা হাত তুলে থামতে ইসারা করল তাদের দু'জনকে।

কী ব্যাপার ?—থমকে দাঁড়িয়ে ফরেস্ট গার্ডদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন পুরুষোত্তম।

ঝরনার ধারে একটা মোষ মারা পড়েছে হুজুর—ফিস্‌ফিসিয়ে বললে ফরেস্ট গার্ডদের একজন—সিংহের কীর্তি…

—সিংহটাকে দেখেছ তোমরা ?

—দেখেছি হুজুর, কাছেই ঘোরাঘুরি করছে।

নিমেষে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল পুরুষোত্তমের মুখ। তিনি সুরজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে সোল্লাসে বললেন, মনে হচ্ছে খুব কাছে থেকেই সিংহমশাইকে দেখতে পাবেন আপনি—দাঁড়ান, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, বলে ফরেস্ট গার্ডদের কাছে গিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে কী সব বললেন তিনি। তারপর সুরজিতের কাছে ফিরে এসে বললেন, চলুন আপাতত ফিরে যাই আমরা বাংলোতে—খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলের দিকে আসব আবার।

সুরজিৎ বললে, বিকেলের দিকে এসে সিংহের দেখা পাব তো ? অতক্ষণ সে কি অপেক্ষা করবে আমাদের জন্যে !

—নিশ্চয়ই করবে। মোষের লাশটাকে যতক্ষণ না খেয়ে শেষ করতে পারছে, ততক্ষণ এখান থেকে সে নড়বেই না।

বিকেল পর্যন্ত অবশ্য অপেক্ষা করলেন না পুরুষোত্তম পাণ্ডেল। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরেই সুরজিতকে নিয়ে রওনা হলেন তিনি।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে টিলার কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন তাঁরা। ফরেস্ট গার্ডরা তাঁদের জন্য একটি পলাশগাছের নীচে বসে অপেক্ষা করছিল—তারা উঠে এসে বললে. সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছি হুজুর—আসুন আমাদের সঙ্গে।

ফরেস্ট গার্ডদের অনুসরণ করে তাঁরা টিলার তলায় ঝরনার ধারে গিয়ে পৌঁছলেন। ঝরনার পাশে জল জমে একটি ডোবার সৃষ্টি হয়েছে। ডোবার চারদিকে ঘাসবনটা ঘন ঘাসে ছেয়ে আছে।

ডোবার ধারে একটি বাবলাগাছের নীচে পড়েছিল মোষের রক্তাক্ত মৃতদেহ। তার ঘাড়ের উপরে গভীর ক্ষত। মেরে মোষটাকে ফেলে রেখেছে সিংহটা—খায়নি এখনো।

মেরে রেখে ওর পরিবারের জন্য অপেক্ষা করছে সিংহটা।—ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন পুরুষোত্তম।

পরিবারের জন্য অপেক্ষা করছে !—সুরজিৎ অবাক হয়ে তাকাল পুরুষোত্তমের মুখের পানে।

করছে বই কি,—মৃদু হেসে বললেন পুরুষোত্তম, আর একটু বাদেই এসে যাবে সবাই…নিজের চোখেই দেখতে পাবেন…এখন আসুন, আমরা গা ঢাকা দিয়ে থাকি।

মোষের মৃতদেহ থেকে একটু দূরে গাছের ডালপালা ও লতাপাতা দিয়ে একটি ঘেরাটোপ তৈরি করে রেখেছিল ফরেস্ট গার্ডরা। পুরুষোত্তম, সুরজিৎ ও তিনজন ফরেস্ট গার্ড তার মধ্যে ঢুকে পড়ে।

আর একটা কথাও নয়,—ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন পুরুষোত্তম, মানুষের গলার স্বর শুনলে হয়তো ওরা কাছেও ঘেঁষবে না।

সুরজিৎ আগে লক্ষ্য করেনি, এবারে দেখতে পায়, অনেকগুলো শকুন আশে-পাশে গাছপালার ওপরে বসে আছে—কয়েকটি মোষের মৃতদেহটির কাছাকাছি মাটির ওপরে বসে অপেক্ষা করছে। হয়তো সিংহের খাওয়া শেষ হলে পর প্রসাদ পাবার আশা রাখে।

শকুনগুলোর মতই নিথর হয়ে বসে থাকেন পুরুষোত্তম ও সুরজিৎ ডালপালার ঘেরাটোপের মধ্যে। তাঁদের পেছনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফরেস্ট গার্ড তিনজন। যেন তিনটি কালো পাথরের মূর্তি।

আশেপাশে কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। শকুনরাও নিঃসাড়। কোন পাখির ডাকও শোনা যায় না। হয়তো বনের পশুপাখিরা স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে পশুরাজের জন্য।

হঠাৎ অদূরে ঘাসবনের মধ্যে মৃদু একটা স্পন্দন জাগে। কোন শব্দ অবশ্য কানে আসে না। স্পন্দনটা এগিয়ে আসে।

সুরজিতের বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করে ওঠে। চারপাশের নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন হাতুড়ির মত ঘা মারে তার হৃৎকম্পের শব্দ, সে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে।

ঘাসবনের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে একটা বড়ো আকারের সিংহ। লেজের ডগা থেকে মাথা পর্যন্ত ন' হাত লম্বা। বাদামী রঙের গায়ের চামড়া—মাথার ওপরে ঘন কালো কেশর।

এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে আসে সে মোষের মৃতদেহটির কাছে। আশেপাশে বসে থাকা শকুনগুলোকে সে যেন দেখেও দেখে না। শকুনগুলোও নির্বিকার। পশুরাজকে দেখে তারা বিন্দুমাত্রও ভয় পেয়েছে বলে মনে হয় না। চুপচাপ বসে থেকে অপেক্ষা করে তারা।

সিংহটি এগিয়ে আসে মোষের মৃতদেহটির কাছে। চোখের নিমেষে মৃত-দেহটির বিভিন্ন অংশ থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নেয়।

চামড়া ছাড়িয়ে নিলেও সে খেতে শুরু করে না। এদিক ওদিক তাকায়, তার হাবভাবে মনে হয় যেন তার অতিথিদের জন্য অপেক্ষা করছে সে।

বেশিক্ষণ অবশ্য তাকে অপেক্ষা করতে হয় না। ঘাসবনের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে দু'টি সিংহী তাদের ছ'টি শাবক নিয়ে। তারা সোজা চলে আসে মোষের মৃতদেহটির কাছে—মৃতদেহটির ওপরে ঝুঁকে পড়ে খেতে শুরু করে।

সুরজিৎ বোঝে যে এরা ঐ সিংহেরই. পরিবার। সিংহটি ওদের দেখামাত্র সরে আসে মৃতদেহটি ছেড়ে। তারপর সুরজিৎ ও পুরুষোত্তমের ঘেরাটোপের কাছে এসে বসে।

পাশেই বসে আছে সিংহটা—ভয়ে সুরজিতের সর্বাঙ্গ কাঁপছে। পুরুষোত্তমের চোখের ইঙ্গিতে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে স্থির হয়ে বসে থাকে সে।

চোখে দেখতে না পেলেও তাদের গায়ের গন্ধ নিশ্চয়ই সিংহটির নাকে গিয়েছে। কিন্তু তাদের দিকে সে ভ্রূক্ষেপও না করে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ভোজনরত সিংহী ও তার শাবকদের দিকে। খানিকক্ষণ বাদে সেও যোগ দেয় তাদের সঙ্গে—সিংহী দু'টির মাঝখানে জায়গা করে নিয়ে খেতে শুরু করে দেয়।

ইতিমধ্যে গাছে বসে থাকা শকুনগুলো মাটিতে নেমে এসেছে—মাটিতে যারা বসেছিল তাদের সঙ্গে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় মোষটির দিকে। তাদের হাবভাবে মনে হল যেন সিংহদের ভোজ শেষ হলেই তাদের খাওয়া শুরু হবে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল সিংহ ও তার পরিবারের খাওয়া শেষ করতে। খাওয়া শেষ করে তারা চলে গেল। ঘাসবনের মধ্যে ঢুকে কোথায় গেল বোঝা গেল না।

সিংহরা চলে যেতেই শকুনের পাল ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ভুক্তাবশেষের ওপরে। মোষের বিশাল দেহের অনেকখানি তখনো অবশিষ্ট ছিল। হয়তো পরে আবার এই বাকি অংশটি খাবার জন্য তারা ফিরে আসবে। কিন্তু ইতিমধ্যে শকুনদের ভোজে কোন বাধা রইল না—আড়াল থেকে লক্ষ্য করলেও সিংহ বা সিংহীরা তাদের তাড়িয়ে দিতে এগিয়ে এল না।

সিংহরা তাদের তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা না করলেও হঠাৎ তারা ভয় পেয়ে গেল প্রচণ্ডরকম। ভয় পেয়ে উড়ে গেল খাওয়া ছেড়ে। কোথায় গেল বোঝা গেল না—ধারে কাছে কোথাও তাদের দেখতে পেল না সুরজিৎ।

শকুনদের এমনি আচমকা দারুণ ভয় পেতে দেখে সুরজিৎ ঘাবড়ে গেছে। সিংহরা ফিরে আসেনি, কিন্তু তবু কাকে দেখে ওরা এমন ভয় পেল? সে কী সিংহের চেয়েও ভয়ঙ্কর কোন জীব!

দেখলেন তো গুহসাহেব, শকুনরা কী রকম পালিয়ে গেল!—ফিস্‌ফিসিয়ে বললেন পুরুষোত্তম,—অথচ সিংহদের দেখে এরা একটুও ভয় পায়নি—সিংহরা যখন খাচ্ছিল, তখন আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছিল ওরা মোষটির দিকে।

সুরজিৎ ঢোঁক গিলে চাপা উত্তেজিত স্বরে বললে, নিশ্চয়ই সিংহের চেয়েও হিংস্র কোন জানোয়ার হবে···

—তাই হবে। তা নইলে কী আর ঐ শকুনগুলো···ঐ দেখুন ঐ কাঁটাঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে···

ইতিমধ্যে নড়ে উঠেছিল অদূরবর্তী কাঁটাঝোপটি—পুরুষোত্তমের মুখের কথা শেষ না হতেই তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল একজোড়া বনবেড়াল।

ও মা, এ যে বনবেড়াল! বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল সুরজিতের চোখ দু'টি : বনবেড়াল দেখে ভয় খেলে ঐ শকুনের পাল!

পুরুষোত্তম গম্ভীর মুখে বললেন, বনবেড়াল স্বভাবে সিংহের চেয়ে অনেক বেশি হিংস্র…শকুনরা তাই ভয় পেয়েছে…

আশ্চর্য ব্যাপার!—বলে ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এল সুরজিৎ।

ঘেরাটোপ থেকে পুরুষোত্তমও বেরিয়ে এলেন। মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে তিনি বললেন, অথচ মজার ব্যাপার এই যে, যে স্বভাবে সত্যসত্যিই সিংহের চেয়েও হিংস্র, তাকে দেখে আপনি বা আমি একটুও ভয় পাচ্ছি নে!

॥ নয় ॥

সিংহের চেয়ে হিংস্র বনবিড়ালের বৃত্তান্ত পড়ে সকলেই বুঝতে পারবেন যে হিংস্রতা স্বভাবজ—তা দৈহিক শক্তির ওপরে নির্ভর করে না। দেহের শক্তিতে ভারতের বন্য প্রাণীদের মধ্যে হাতি সবচেয়ে শক্তিশালী হলেও সহজেই সে মানুষের পোষ মানে এবং অকারণ হিংস্রতায় কদাচিৎ উন্মত্ত হয়ে ওঠে।

হাতি সম্পর্কে অনেক বিচিত্র তথ্য আমি উড়িষ্যার বনবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার বনমালী রাউতের কাছে জানতে পেরেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, মানুষ যদি না থাকত, পৃথিবীতে হয়তো হাতিরাই রাজত্ব করত।

বনমালীবাবু উড়িষ্যার শিমলিপালের বনের এলাকার মধ্যে খামার তৈরি করেছিলেন। আমাকে তিনি সেই খামার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বনের অধিবাসী আদিবাসী ছাড়া কারুরই অধিকার নেই সংরক্ষিত বনের মধ্যে কোনও রকম চাষবাস করার। এ হেন অবস্থায় বনের মধ্যে খামার গড়ে তোলার জন্য কি করে জমি ইজারা পেলেন বনমালী তা আমি ভেবে পাই না। বনমালী অবশ্য আমাকে বলেছিলেন যে জমি ইজারা পেয়েছিলেন তিনি ময়ূরভঞ্জের মহারাজার কাছ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে। তখন ময়ূরভঞ্জ ছিল একটি দেশীয় করদরাজ্য। স্বাধীনতার পর করদরাজ্যটি উড়িষ্যার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরে মহারাজার দেওয়া ইজারাটি সরকারী বনবিভাগ নাকি মঞ্জুর করেছিলেন।

বনমালী বলে চলেন, এই যে রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছি, এটা আমি হাতির চলার পথকে অনুসরণ করে তৈরি করেছি। আশ্চর্য ওদের রোড্ সেন্স। পাহাড়ে উঠতে গেলে কখনোই ওরা সোজাসুজি উঠে যায় না—পাহাড়কে বেষ্টন করে ঘুরে ঘুরে ওঠে। হাতির পায়ে-চলা পথ ধরে পাহাড়ী এলাকায় অনায়াসে সড়ক তৈরি করা চলে।

আমি বললাম, আশ্চর্য ব্যাপার তো!

—আরও সব আশ্চর্য ব্যাপার রয়েছে হাতির চরিত্রে। জানেন, হাতি খুব স্নেহশীল?

—সত্যি!

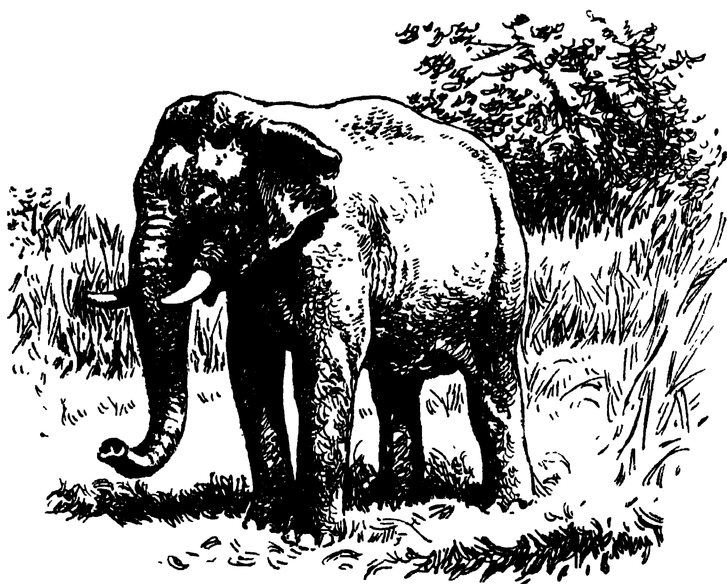
—হ্যাঁ। তার সন্তানস্নেহ মানুষের সন্তানস্নেহের মতই গভীর। পোষমানা হাতি মানুষের শিশুকেও স্নেহ করে। হাতরাসে আমি একটি পোষা হাতিকে

দেখেছিলাম তার মাহুতের শিশুকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে। মাহুতের বৌ বাচ্চাটিকে হাতির হেফাজতে রেখে ঘরের কাজকর্ম করত।

—ব্যাপারটা খুব অবিশ্বাস্য বলে শোনাচ্ছে কিন্তু মিস্টার রাউত।

অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য।—গম্ভীর মুখে বললেন বনমালী,—স্নেহ-মমতা শুধু নয়, পরার্থপরতাও রয়েছে হাতির চরিত্রে। প্রায়ই সে নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দলের আর সবাইকে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। আমি একদিন বনের মধ্যে গর্তে পড়ে যাওয়া হাতিকে সাহায্য করতে আর একটা হাতিকে এগিয়ে আসতে দেখেছিলাম।

জীপ ততক্ষণে বনবিভাগের একটি চেক্ পোস্টের কাছে এসেছে। পাহারাওয়ালা মোতায়েন করা আছে এখানে। বন থেকে বে-আইনীভাবে কাঠ কেটে আনা হচ্ছে কি-না তার দিকে নজর রাখে সে।



পাহারাওয়ালা হাত তুলে গাড়ি থামিয়ে বললে, বনের মধ্যে আর এগোবেন না হুজুর।

বনমালী বললেন, না এগোলে আমার খামারে পৌঁছাব কী করে?

—খামারে আজ নাই বা গেলেন হুজুর—বনের মধ্যে একটা বড় হাতির দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। দলটা নতুন বলে মনে হচ্ছে—বোধ হয় গোরুমাহিষাণীর দিক থেকে এসেছে।

—নতুন দল !

—হ্যাঁ হুজুর। বনের মধ্যে যে দল আগেই আস্তানা নিয়েছে, তার সঙ্গে লড়াই বাধল বলে।

—কোন ভয় নেই দুর্যোধন মাহাতো, হাতির দলের সঙ্গে দলের লড়াই কখনোই হয় না—লড়াই বাধে দল-ছুট গুণ্ডা হাতিদের মধ্যে। দল বেঁধে থাকা হাতিরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। কুড়ি থেকে ত্রিশটা হাতি একসঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ-ভাবে বসবাস করে থাকে। অন্য দলের সঙ্গে সংঘর্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা তারা কল্পনাও করতে পারে না। দলের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং অন্য দলের সঙ্গে সৌহার্দ্য যাতে বজায় থাকে তার জন্য মাদী হাতিরা খুবই তৎপর।

আমি বললাম, আপনি বলতে চান যে শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে পুরুষ-হাতিরা তেমন তৎপর নয় ?

বনমালী বললেন, না—পুরুষ হাতিরা সাধারণতঃ স্বার্থপর হয়ে থাকে একই দলের পুরুষ হাতিদের মধ্যে লড়াই বেধে যাওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। মারা-মারিতে যে হেরে যায়, সে বাধ্য হয় দল ছাড়তে ! পুরুষ-হাতিদের মারামারিতে মাদী হাতিরা সাধারণতঃ নিরপেক্ষ থাকে—পুরুষ-হাতিরা মারামারি করে মরে গেলেও তারা দুঃখিত হয় না। তাদের নজর শুধু দলগত ঐক্য, শান্তি এবং শৃঙ্খলার দিকে। দলের ঐক্য বজায় রাখার জন্য তারা প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে। বড়ো বড়ো জীবতত্ত্ববিদরা লক্ষ্য করেছেন যে দলের নেতৃত্ব সাধারণতঃ বয়োজ্যেষ্ঠা মাদী হাতিই করে থাকে।

বনবিভাগের পাহারাওয়ালা দুর্যোধন মাহাতো ক্ষীণস্বরে বললে, আপনি তাহলে বলতে চান এই দুই দলের মধ্যে লড়াই বাধবে না ?

—না দুর্যোধন, লড়াই কিছুতেই বাধবে না—তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। চলুন রায়সাহেব, এগিয়ে যাওয়া যাক—নইলে সন্ধ্যার আগে পারব না আমার খামারে পৌঁছতে—বলে জীপে আবার স্টার্ট দিলেন বনমালী।

বন ক্রমশ গভীর হয়ে আসে। শাল, পিয়াশাল, আসান, ধও ও কোংরা গাছের ঠাসবুনানির মধ্যে দিনের আলো নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে—নিস্তেজ হয়ে আসে গ্রীষ্মের দুপুরের দাবদাহ। বড় বড় গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে গজিয়েছে ছোট ছোট বনপান ও বুনো হলুদের ঝোপ…ছোট-বড় সব রকম গাছকে আচ্ছন্ন করেছে রকমারি বন্য লতা। বনের সবুজ আচ্ছাদনকে চিরে এগিয়ে গিয়েছে কাঁকরে ছাওয়া রাঙিন পথ। দেখে মনে হচ্ছে যেন বনের সবুজ শরীরটাতে ছুরি চালিয়ে কেউ রক্ত বের করে দিয়েছে।

এই রক্ত-রাঙিন পথ ধরে এগিয়ে যেতে যেতে হাতির দলের কোন চিহ্নই নজরে এল না আমাদের। তাদের আনাগোনার কোন স্বাক্ষরই পড়ে নি গাছপালার মধ্যে।

আমি বললাম, দু দু'টো দলের একটাও তো নজরে আসছে না মিস্টার রাউত ···এ বন ছেড়ে চলে গিয়েছে নাকি এরা ?

বনমালী বললেন, নজরে না এলেও নিকটেই আছে···বুঝলেন রায়সাহেব, রীতিমতো নিঃশব্দে চলাফেরা করে বেড়ায় এরা। আয়তনে ও ওজনে বিশাল হলেও কোনও রকম শব্দ না করেই এরা হাঁটতে পারে। এটা অবশ্য এদের মাংসল পায়ের জন্যই সম্ভব হয়েছে—এদের পায়ের নীচে নরম মাংসপিণ্ড প্যাডের মত বসানো থাকে। শব্দ না করে হাঁটে বলেই এদের উপস্থিতি অন্য জন্তু জানোয়াররা টের পায় না···এদের কাছাকাছি থেকেও তারা স্বচ্ছন্দে এবং নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়···

বনমালীর উক্তি যে কতখানি সত্য তা পদে পদে অনুভব করি। বনের সড়ক ধরে যেতে যেতে অনেকগুলো হরিণ, খরগোশ, সজারু ও বন-ময়ূরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হল আমাদের। তারা ভয় পায় আমাদের দেখে—হাতির দলের সান্নিধ্য তাদের বিন্দুমাত্রও বিচলিত করেছে বলে বোধ হল না।

বনমালী বললেন, এমন চমৎকার জন্তু হাতি, মানুষকে বাদ দিলে কোন প্রাণীই তার মত বুদ্ধিমান নয়···আয়ু মানুষের সমান···

আমি বললাম, হাতির পরমায়ু মানুষের চেয়ে বেশি বলেই তো জানি আমরা। কোন কোন জীববিজ্ঞানী বলেন যে, হাতির দাঁতের ওজন যত পাউণ্ড, তার বয়সও নাকি তত বছর।

—তা হলে তো অতিকায় দাঁতওয়ালা হাতির পরমায়ু দু'শো ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু এমন অপরিমিত পরমায়ু তো অসম্ভব ব্যাপার! কাজেই দাঁতের ওজন দিয়ে হাতির বয়স নির্ণয় করা ঠিক হবে না। অধিকাংশ জীববিজ্ঞানীর মতে হাতির বয়স গড়পড়তা সত্তর থেকে আশি পর্যন্ত হয়ে থাকে—খুব স্বাস্থ্যবান হাতি বড়-জোর শতায়ু পর্যন্ত হতে পারে। অর্থাৎ মানুষের কাছাকাছি হাতির পরমায়ু। সাধারণ জন্তুদের মত আত্মসর্বস্ব নয় সে···মানুষের মতই পরার্থপরতা দেখা যায় তার মধ্যে···অথচ এ হেন হাতিকে পোষ মানাবার চেষ্টা ভারত, বর্মা ও শ্যামদেশ (থাইল্যাণ্ড) ছাড়া অন্য কোনও দেশে দেখা যায় না। আফ্রিকাতে হাতির সংখ্যা ভারতের চেয়ে অনেক বেশি, অথচ ওখানকার হাতিকে পোষ মানাবার চেষ্টা এক-মাত্র হ্যানিবল ছাড়া আর কেউই করেন নি এ পর্যন্ত। তার কারণ অবশ্য এই নয় যে আফ্রিকার হাতির প্রকৃতি এশিয়ার হাতিদের তুলনায় বেশী বন্য। তার একমাত্র কারণ এই যে হাতিকে নিজের সাথী করে নেওয়ার সাধ একমাত্র এশিয়ার দেশের মানুষদের মধ্যেই দেখা গিয়েছে।

বনমালীর খামারে যখন পৌঁছলাম তখন বিকেল প্রায় চারটে। খামারের কাছে গাড়ি থামিয়ে বনমালী বললেন, নেমে আসুন—দেখে যান আমার খামারটা।

গাড়ি থেকে নেমে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলাম। শাল-পিয়াশাল-আসানের বেষ্টনীর

মাঝখানে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে একটা বুনো কলাগাছের বাগান। অসংখ্য গাছে কলার কাঁদি ঝুলছে—কিন্তু সেগুলো মানুষের খাওয়ার অযোগ্য।

বনমালী বললেন, এই আমার খামার।

আমি বললাম, খামারে তো শুধু বুনো কলাগাছ ফলিয়েছেন—কিন্তু এ কলা কি মানুষ খেতে পারে?

—না। এ কলা ও কলাগাছ হাতিদের খুব প্রিয়…ওদের জন্যই আমার সমস্ত খামার জুড়ে এই বুনো কলাগাছ লাগিয়েছি…বন্য হাতিদের মধ্যে সাংঘাতিক খাদ্যসমস্যা দেখা দিয়েছে কিনা…

বুনো হাতিদের খাদ্যসমস্যা মেটাতে চান আপনি!—আমার চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল!

—হ্যাঁ। কারণ, বনের মধ্যে হাতিরা পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য পাচ্ছে না। বনের মধ্যে কচি বাঁশ, বুনো কলাগাছ প্রভৃতি যে সব গাছপালা হাতির খাদ্য, তাদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে এবং হাতিরা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না। একটা হাতির কী পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন তা একটা পোষা হাতির খোরাক থেকে বোঝা যাবে। পোষা হাতি দিনে অন্ততঃ পক্ষে দেড় মণ ধান. খড়-বিচালি, ভুষি, আটা, গুড় ইত্যাদি খেয়ে থাকে। গাছপালা থেকে সমপরিমাণ খাদ্য না পেলে বুনো হাতির পক্ষেও বেঁচে থাকা কঠিন। আমার ধারণা বুনো হাতিদের সংরক্ষণ করতে হলে তাদের আহার জোগাবার দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। হাতিরা যে সব বনে বাস করে, সেই সব বনে কলাগাছ, বাঁশ ও বুনো ঘাসের চাষ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম আমি সরকারী বনবিভাগের কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু আমার প্রস্তাবে তাঁরা সাড়া দেন নি। কাজেই এই খামার আমি নিজেই তৈরি করেছি।

আমি বললাম, সব বনেই কী এ ধরনের খামার গড়ে তুলবেন নাকি?

সে তো আর সম্ভব নয়।—মৃদু হেসে জবাব দিলেন বনমালী,—তবে আমার দু'চারজন বিদেশী বন্ধু আছেন, যাঁরা বন্য পশু বিশেষ করে হাতির সংরক্ষণে খুবই উৎসাহী। এদেশের অন্যান্য জঙ্গলে এ ধরনের খামার তৈরি করার জন্য টাকা খরচ করতে তাঁরা প্রস্তুত।

আমি বললাম, আপনার খামারে হাতিরা আসে তো?

নিমেষে ম্লান হয়ে উঠল বনমালীর মুখ। ঢোক গিলে তিনি বললেন, না, আসে নি এখনো…তবে শিগ্‌গিরই আসবে বলে আশা রাখি…

খামারের গায়েই বনমালীর কাঠের বাংলো। সেদিন রাত্রের মত সেখানেই আশ্রয় নিলাম আমরা।

তখন মাঝরাত। আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। আমার ঘুম ভাঙিয়ে বনমালী উত্তেজিত স্বরে বললেন, দেখবেন আসুন—হাতিরা এসে গিয়েছে।

ধড়মড় করে বিছানার ওপরে উঠে বসলাম আমি। বনমালীকে অনুসরণ করে বাংলোর বাইরে এসে দাঁড়াই। কৃষ্ণপক্ষের স্তিমিত জ্যোৎস্নায় একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল আমার। অনেকগুলো বড়ো আকারের ছায়ামূর্তি কলাবাগানের মধ্যে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে কলাগাছগুলোও প্রবল বেগে দুলতে শুরু করেছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ধরাশায়ী হল কয়েকটি কলাগাছ।

হাতিদের ভোজ শুরু হয়েছে।—রুদ্ধশ্বাসে বললেন বনমালী।

চোখে স্পষ্ট দেখা যায় না—তথাপি হাতিদের ভোজনপর্বটা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে অস্ফুট জ্যোৎস্নার আলোয়—অনেকগুলো কলাগাছ সদ্ব্যবহার করে ফেলে তারা…

বনমালীর মুখে পরিতৃপ্তির হাসি। অস্ফুট কণ্ঠে তিনি বললেন, আজ আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হল।…

পরদিন সকালে দিনের আলোয় বনমালীর খামারের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠি। কলাগাছগুলোর অধিকাংশই নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আমি বললাম, কটা হাতি এসেছিল মিস্টার রাউত? আপনার খামারের বিশেষ কিছুই তো আর অবশিষ্ট নেই।

মুখ কাচুমাচু করে বনমালী বললেন, বোধ হয় শিমলিপাল জঙ্গলের সব হাতিই এসেছিল… মোট শ' আড়াই তো হবেই…

—শিমলিপাল জঙ্গলের সব হাতির খোরাক জোগাতে কি পারবেন মিস্টার রাউত? আড়াইশো হাতির চাহিদার অনুপাতে আপনার খামারটা তো খুবই ছোট…সবাই মিলে দু' দিনেই আপনার খামারের সবকটা কলাগাছ সাবাড় করে দেবে বলে মনে হচ্ছে!

আরও বড় খামার গড়ে তুলতে হবে আমাকে।—বনমালী দৃঢ় স্বরে বললেন, এ জঙ্গলের সব হাতিরই খোরাক জোগাব আমি…

॥ দশ ॥

হাতি সম্বন্ধে বনমালীবাবুর অভিজ্ঞতা যাই হোক না কেন, বুনো হাতিকে সবাই ভয় পায়। ও রকম অতিকায় আকারের জন্তু হিংস্র হয়ে উঠলে তার আক্রমণ কী রকম মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে ভেবে আতঙ্কিত হয় সকলে। অনেক অভিজ্ঞ শিকারীকে বলতে শুনেছি, মাংসাশী না হয়েও অকারণ হিংসা হাতির স্বভাবগত। বিনা প্ররোচনাতেই আক্রমণ করতে পারে—কাজেই বুনো হাতির কাছ থেকে তফাতে থাকাই নিরাপদ।

এ হেন হাতিকে বন্ধু বলে মনে করতো একজন সাঁওতাল বুড়ি। রাখা মাইনসের কাছে বনের মধ্যে আলাপ হয়েছিল আমার তার সঙ্গে।

পূর্ণপানি নামে একটি গাঁয়ের কাছে চাপরি পাহাড়ের পশ্চিমদিকে উপত্যকার মধ্যে তখন আমি তামার সন্ধানে আছি। একদিন শাল, পিয়াশাল আর নানা রকম বুনো লতার ঝোপের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আমি হঠাৎ পথ হারিয়ে ফেলেছি—কম্পাসের সাহায্যেও কোথায় আছি বুঝতে পারছি না। কোন্ দিকে যাব ঠিক করতে না পেরে অসহায়ের মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, এমন সময় এই সাঁওতাল বুড়িটি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, পথ হারিয়ে ফেলেছিস নাকি বাবু?

বুড়িকে দেখে যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। বললাম, হ্যাঁ বুড়িমা, এখানে বন এত ঘন যে, পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

—পথ তো তোর পাশেই। খিল খিল করে হেসে উঠে বুড়ি বললে, ভালো করে নজর দিয়ে দেখলেই দেখতে পাবি।

সত্যিই তাই। পথের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, বুনো ঘাসের ঘন আচ্ছাদনের জন্য এতক্ষণ তা আমার নজরে আসে নি।

কোথায় যাচ্ছিস বাবু? বুড়ি প্রশ্ন করলে।

—যাচ্ছি সুর্দা হয়ে পাথরঘড়া।

—সে তো অনেক দূরের পথ—পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে। আয় আমার ঘরে বসে একটু বিশ্রাম করবি।

ঘন বনের মধ্যে ছোট্ট একটি গ্রাম—চার পাঁচখানার বেশি ঘর নেই। বুড়ি তার ঘরে একাই থাকে। তিন কূলে কেউই নেই তার। তার ঘরের সামনে একটা নীচু চারপাইয়ের ওপরে বসে পড়ে আমি বললাম, এই বনে পাহাড়ের নীচে আছিস কি ভাবে বুড়িমা? হাতি নামে না?

গম্ভীর মুখে বুড়ি বললে, নামে। নেমে ক্ষেতের চারা ধানগুলো নষ্ট করে। তবু হাতি আমার বন্ধু।

—হাতি তোর বন্ধু!

—হ্যাঁ, বন্ধু। একটা বুনো হাতি একদিন জল খাইয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল আমার। শুধু তাই নয়, পথ দেখিয়ে পৌঁছেও দিয়েছিল এই গ্রাম পর্যন্ত।

—তাই নাকি!

—আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তোর? তা হলে শোন্, ঘটনাটি বলি তোকে।

বুড়ির কাছে শোনা সেই ঘটনাই আজ আমি শোনাতে বসেছি।

বুড়ি একদিন ধনজোরি পাহাড়ের কাছে তসরের গুটি কুড়োতে গেছে। ফেরার পথে খুব তেষ্টা পেল তার। কাছাকাছি কোন নদী বা নালা নেই, কাজেই সে উত্তর দিকের পাহাড়ে গেল ঝরনার খোঁজে। ঐ অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেকটি পাহাড়ের গায়ে কোয়ার্টজাইট পাথরের ফাটলের ফাঁক দিয়ে জল বেরিয়ে এসে ঝরনা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বুড়ি যে পাহাড়ে গেছে, দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে কোন ঝরনা নেই। বহুক্ষণ ব্যর্থ সন্ধানের পর নেমে এল সে পাহাড় থেকে।

আর তখনই হল কেলেঙ্কারী। পাহাড় থেকে নেমে এসে ঘন বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলে বুড়ি। অনেক ঘোরাঘুরি করেও সে খুঁজে বের করতে পারে না পূর্ণপানির পথ। দিশেহারার মত বহু দূর পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করে একটা পাহাড়ের নীচে এসে সে বসে পড়ে ক্লান্তিভরে। পিপাসায় তখন তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে, শ্রান্তিতে অসাড় হয়ে পড়েছে তার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আর এক পাও সে হাঁটতে পারবে না।

হঠাৎ তার সুমুখের বাঁশবনটা নড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে শুকনো পাতার স্তূপের ওপর ভারি পা ফেলার শব্দ। চমকে উঠে বুড়ি তাকিয়ে দেখে যে, একটা বিশাল দাঁতালো হাতি তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

হাতিটার চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যে, তাকে দেখে ভয় পেল না বুড়ি। হাতিটা কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ করল কি, তার শুঁড়টা নিজের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল পুরোপুরি। বুড়ি দেখে বুঝতে পারে, শুঁড়টা পাকস্থলীর ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে হাতিটা। কয়েক মুহূর্ত বাদে শুঁড়টা বের করে আনে সেই হাতি। তারপর শুঁড় থেকে বুড়ির সামনে একটা গর্তের মধ্যে ঢেলে দিল এক রাশ জল।

উটের মত হাতির পাকস্থলীতেও একটা জলের আধার থাকে। দরকার মত পেটে শুঁড় ঢুকিয়ে শুষে বের করতে পারে সে সেই জল।

আকণ্ঠ সেই জল পান করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বুড়ি—সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকায় হাতিটার দিকে।

জল খেয়ে বুড়ি যখন সুস্থ বোধ করছে, তখন হাতিটা চলতে শুরু করে। হঠাৎ কি মনে করে বুড়ি তাকে অনুসরণ করে। হাতিটা পাহাড়ের ওপরে উঠতে থাকে পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে। তাকে অনুসরণ করতে বুড়ির তাই একটুও কষ্ট হয় না।

পাহাড়ের মাথায় উঠতেই উত্তর দিকে টাটানগর-মোসাবনীর সড়ক দেখতে পেল বুড়ি। হাতিটা আর এগোয় না, বুড়ি সড়ক লক্ষ্য করে হাঁটতে থাকে।

ঘটনাটি বলা শেষ হলে বুড়ি বললে—বুঝলি বাবু, ভয় পাবি না। ভয় পেলেই বিগড়ে যায় জংলী জানোয়ারদের মেজাজ। ভয় না পেয়ে মনে করিস তোরা যেমন আছিস, ওরাও তেমনি আছে। ওদের ওপরে হামলা করিস না, তাহলে ওরা তোকে কিছু বলবে না। আর আমার মত যদি বিশ্বাস রাখতে পারিস, তবে জংলী জানোয়ারের বন্ধুত্ব পেয়ে যাবি।

॥ এগার ॥

হাতির বন্ধুত্বের চেয়েও অবিশ্বাস্য ঘটনার মুখোমুখী হয়েছিলাম আমি ভুটান ও পশ্চিমবাংলার সীমান্তে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করতে গিয়ে। ভুটানের দক্ষিণ-পশ্চিমে সামচি নামে একটি ছোট শহরকে কেন্দ্র করে কাজ করছিলাম আমি তখন। সামচি শহরটি গড়ে উঠেছে হিমালয়ের দক্ষিণের নীচু পাহাড়ের শ্রেণী বা ফুট-হিলস-এর (**foot-hills**) নীচে। এই পাহাড়ে আছে ডলোমাইট (**dolomite**) ও টালক (**talc**) নামে খনিজ—জায়গায় জায়গায় তামার লক্ষণও দেখা যায়। সামচিতে থেকে আমি তখন এই পাহাড়ে এই সব খনিজের খোঁজ নিচ্ছি।

পাহাড়ের গায়ে ঘন বন। এই বনই তরাইয়ের বন নামে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে পাহাড় বরাবর প্রসারিত হয়েছে। বনটা অবশ্য পাহাড়ের সীমা ছাড়িয়ে দক্ষিণের সমতলভূমিকে ছেয়ে ফেলেছে। তরাইয়ের বনশ্রেণীর অন্তর্গত হলেও জলদাপাড়া ও কাজিরাঙ্গার 'অভয়-অরণ্য' সমতলভূমির মধ্যেই অবস্থিত। অভয়-অরণ্য মানে সংরক্ষিত বন। বনের পশুরা এখানে নিরাপদে বসবাস করতে পারে।

তরাইয়ের বন দিয়ে ছাওয়া পাহাড়ের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে করতে বনবিভাগের একজন অফিসারের সঙ্গে আমার দেখা হল। সে আমার কলেজের বন্ধু। তার নাম প্রকাশে বাধা আছে বলে এই কাহিনীতে তাকে আমি "বনবিহারী" নামে উল্লেখ করছি। বনবিহারী বনের মধ্যে যে রকম সন্তর্পণে ঘোরাঘুরি করছিল, তাতে মনে হচ্ছিল কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। তাকে প্রশ্ন করতে প্রথমে সে কোন জবাব দিল না। জবাব না পেয়ে জানবার ঝোঁক আমার বেড়ে যায়। রীতিমত পীড়াপীড়ি করতে থাকি আমি তাকে। শেষ পর্যন্ত সে বললে, তোমাকে বলছি, কিন্তু কাউকে বোলো না যেন—কারণ, ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়···

আমি বললাম, কাউকে বলব না আমি ভাই, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

এদিক ওদিক তাকিয়ে গলার স্বর নামিয়ে বনবিহারী বললে, গণ্ডার খুঁজছি ভাই—'পোচার'দের তাড়া খেয়ে গোটা দুই গণ্ডার জলদাপাড়ার জঙ্গল থেকে পালিয়ে এখানে চলে এসেছে!

—'পোচার' মানে ?

—'পোচার' মানে ইংরেজীতে যাকে বলে **poacher**—অর্থাৎ যে শিকারী বিনা অনুমতিতে সংরক্ষিত বনের মধ্যে ঢুকে শিকার করছে। জানো নিশ্চয়ই যে

গণ্ডার মারা একেবারে নিষেধ—জলপাইগুড়ি জেলার জলদাপাড়া ও আসামের কাজিরাঙ্গার সংরক্ষিত বনে মোট মাত্র পাঁচশোর মত গণ্ডার অবশিষ্ট রয়েছে—সরকারী বনবিভাগ এদের বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

—শুনেছি গণ্ডার স্বভাবে খুব হিংস্র হয়ে থাকে—তার গায়ের জোরের জন্য হাতিও তাকে ভয় পায়। সেদিন একজন ফরেস্ট গার্ডের কাছে শুনেছিলাম যে বছর কয়েক আগে একটা গণ্ডার দু-দুটো বাঘকে কাবু করে ফেলেছিল। এ হেন হিংস্র জানোয়ার যদি তেড়ে মারতে আসে, আত্মরক্ষার জন্যও কি তাকে মারা চলবে না?

নিশ্চয়ই না,—মৃদু হেসে বললে বনবিহারী ঃ গণ্ডার তেড়ে মারতে আসলেও তাকে মারা নিষেধ। গণ্ডার যদি তাড়া করে, পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হবে।

সে কি সম্ভব?—আমি অবাক হয়ে বললাম ঃ গণ্ডারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়াতে কি কোন মানুষ পারবে?

—তা না পারুক, গণ্ডারের নজরের বাইরে চলে যেতে পারবে। তার মানে গণ্ডারের নজর বেশীদূর পর্যন্ত যায় না—তার নজরের সীমার বাইরে চলে যেতে পারলে সে আর তাকে দেখতেই পাবে না। যাকে চোখে দেখা যায় না, তাকে আক্রমণ করা সহজ নয়। তবে গণ্ডার বিনা প্ররোচনাতে তেড়ে আসে না সাধারণতঃ। শিকারীদের পাল্লায় পড়লে প্রথমে সে চেষ্টা করে পালাতে। কিন্তু পালাতে গিয়ে যখন সে বোঝে যে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানো শক্ত, তখন সে নাকের ওপরকার খড়্গ বা শিং বাগিয়ে সোজা ছুটে আসে শিকারীর দিকে। আমি যে গণ্ডার দু'টির খোঁজে এখানকার বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তারা 'পোচার'-দের পাল্লায় পড়েই জলদাপাড়ার সংরক্ষিত বনের এলাকা থেকে পালিয়ে এসেছে।

—নিষেধ সত্ত্বেও শিকারীদের গণ্ডার মারার ঝোঁক কেন জানতে পারি কি?

—গণ্ডারের শিংয়ের লোভে শিকারীরা গণ্ডার মেরে থাকে। এক একটা সাধারণ আকারের আট-ন' ইঞ্চি লম্বা শিং কয়েক হাজার টাকা দামে বিক্রি হয়ে থাকে।

একটা গণ্ডারের শিংয়ের এত দাম!—আমার চোখ দু'টি বড়ো বড়ো হয়ে উঠল ঃ কেন বল তো?

বনবিহারী বললে, অনেকের বিশ্বাস গণ্ডারের শিং গুঁড়ো করে খেলে দেহের শক্তি বাড়ে, বুড়ো মানুষ তার যৌবন ফিরে পায়। কিন্তু আসলে গণ্ডারের শিংয়ের কোন গুণই নেই। সুইজারল্যাণ্ডের একটি ল্যাবোরেটারীতে পরীক্ষা করে গণ্ডারের শিংয়ের মধ্যে মানুষের দেহের শক্তি-বর্ধক কোন উপাদানই খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল জেনেও গণ্ডারের শিংয়ের

ওপরে মানুষের লোভ এতটুকু কমেনি। কারণ, যারা গণ্ডারের শিং গুঁড়ো করে ওষুধ হিসাবে খায়, তাদের অন্ধ বিশ্বাসকে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তর্ক দিয়ে ঠেকানো যায়নি। কাজেই গণ্ডারের শিং-এর চাহিদা ক্রমশঃ বেড়েই যাচ্ছে।

—গণ্ডারের শিংয়ের যে কোন গুণ নেই তা এদের মধ্যে প্রচার করলেই তো পার।

—তা তো করছিই। আমি নিজে একটা প্রচার পুস্তিকা ছাপিয়ে বিলি করেছি, কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। আমার এই পুস্তিকাটির মধ্যে আমি ফলাও করে লিখেছি যে গণ্ডারের শিং আসলে আগাগোড়া লোম দিয়ে তৈরী। লোমগুলি পরস্পরের গায়ে মিশে জমাট বেঁধে হাড়ের মতো শক্ত হয়েছে। এহেন বস্তুর মধ্যে যে কোন রকম দ্রব্যগুণ থাকতে পারে না তা আমি বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্কের সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া এ-ও লিখেছি যে গণ্ডারের শিং তার নাকের ওপরে আলগাভাবে বসানো আছে—তাকে কেটে আলাদা করে ফেললে গণ্ডারের কোন ক্ষতি হয় না। যেমন নখ গজায়, তেমনি গণ্ডারের শিং কেটে ফেললে শিংও গজায়। কাজেই শিং-এর জন্য গণ্ডারকে মেরে ফেলার দরকার নেই—তার নাকের ওপর থেকে শিংটাকে কেটে ফেললেই হয়···

আমি হেসে ফেলে বললাম, জ্যান্ত গণ্ডারের নাকের ওপর থেকে শিং কেটে ফেলার দুঃসাহস কারুর হবে ?

বনবিহারী বললে, গণ্ডারের শিং-এর ওপরে যার লোভ নেই, তার হয়তো হবে না—কিন্তু যে গণ্ডারের শিং পেতে চায়, তাকে দুঃসাহসী হতেই হবে। আমি ভাবছিলাম এই সব 'পোচার'-দের ধরে শিখিয়ে দিই কী করে জ্যান্ত গণ্ডারের নাকের ওপর থেকে শিং কেটে ফেলতে হয়।

আমি অবাক হয়ে বললাম, জ্যান্ত গণ্ডারের নাকের ওপর থেকে শিং কাটার অভিজ্ঞতা তোমার আছে না কি ?

—আমার নেই, আছে আমার দু'জন নেপালী ফরেস্ট গার্ড-এর। এরা আগে জ্যান্ত গণ্ডারের নাকের ওপর থেকে শিং কেটে গণ্ডারের শিং-এর কারবারীদের কাছে বেচে দিত। আমার কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার পর থেকে অবশ্য ও-কাজ ওরা ছেড়ে দিয়েছে। আমার অবশ্য ইচ্ছে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের অনুমতি নিয়ে আবার ওদের ও-কাজে লাগিয়ে দিই। জ্যান্ত গণ্ডারের নাকের ওপর থেকে শিং কেটে নিলে 'পোচার'দের খপ্পর থেকে তাদের প্রাণ বাঁচবে—ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টেরও মুনাফা হবে গণ্ডারের শিং বেচে।

—ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট কি আর সে অনুমতি দেবে তোমাকে ?

দেবে না বলেই মনে হয়।—ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বনবিহারী : কাজেই 'পোচার'-দের ক্রিয়াকলাপ চলতেই থাকবে আর আমাদের ছোটাছুটি করতে হবে

ওদের বা পালিয়ে যাওয়া গণ্ডারদের পেছনে পেছনে।

এদিকে পালিয়ে আসা গণ্ডার দু'টির হদিস কিছু পেলে?—আমি প্রশ্ন করলাম।

—পাচ্ছি আর কোথায়! যারা কেবল পালিয়েই বেড়ায় তাদের ধরা কি সোজা কথা!

—চল আমিও তোমার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে গণ্ডার দু'টিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করি।

—বনের মধ্যে ঘোরাঘুরি তুমিও তো করছিলে—কী সব খুঁজছিলে যেন···

—খুঁজছিলাম ডলোমাইট, টালক, তামাযুক্ত চ্যালকোপাইরাইট প্রভৃতি খনিজ পদার্থ। তোমার সঙ্গে গণ্ডারের খোঁজ নিতে নিতে এই সব খনিজ পদার্থেরও সন্ধান নেওয়া যাবে। আসল কথা কী জান, আসল কথা হচ্ছে এই যে এখানকার বনের মধ্যে যে গণ্ডার লুকিয়ে আছে তা তোমার কাছে জানার পর আর একা ঘোরাঘুরি করতে সাহস পাচ্ছি না। তুমি তো লোকজন, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘুরছ—কাজেই তোমার সঙ্গ নেওয়াই আমার পক্ষে নিরাপদ হবে।

বেশ তো, নাও আমর সঙ্গ। —মুখ টিপে হেসে বললে বনবিহারী: কিন্তু আমার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে করতে হয়তো তোমাকে তোমার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র থেকে সরে আসতে হবে! কারণ গণ্ডার সাধারণতঃ ঘাসবনের মধ্যে থাকতেই ভালবাসে।

—তাতে কোন ক্ষতি নেই—কারণ খনিজপদার্থগুলো যেখানে থাকার, সেখানেই থাকবে, তারা পালিয়ে যাবে না—পরে খুঁজলেও তাদের খোঁজ পেয়ে যাব। কিন্তু গণ্ডার দু'টি যদি পালিয়ে যায়, আর তাদের নাগাল পাওয়া যাবে না।

সত্যিই পাওয়া যায় না তাদের নাগাল। পাহাড়ের নীচে ঘন ঘাসবনের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে করতে পাহাড়ী নালার (স্থানীয় ভাষায় "খোলা") ধারে গণ্ডারের পায়ের চিহ্ন আবিষ্কার করে বনবিহারী। এই সব পায়ের চিহ্ন পরীক্ষা করে বনবিহারীর মনে হল তারা যেন আবার জলদাপাড়ার দিকেই ফিরে গিয়েছে।

গণ্ডারদের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে আমরা পূর্বদিকে চলতে থাকি। ঘাসবনের মধ্যে কাঠুরেদের পায়ে পায়ে তৈরী পায়ে-চলা পথের ওপর দিয়ে বনবিভাগ জীপ চলাচলের উপযোগী রাস্তা তৈরি করেছে। এই রাস্তা ধরে চলতে থাকি আমরা।

বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে বনবিহারীর কাছ থেকে গণ্ডারদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি। তিনশো বছর আগে পর্যন্ত উত্তর ভারতের সর্বত্র গণ্ডার দেখা যেত। হিমালয়ের নীচে অরণ্য-অঞ্চল জুড়ে ছিল তাদের বিচরণক্ষেত্র। তৈমুরলঙ্গ ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরে গণ্ডার শিকার করেছিলেন, সম্রাট বাবর গণ্ডার মেরেছিলেন সিন্ধুনদের তীরে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দ নাগাদ। বাবর যখন গণ্ডার মারলেন, সে সময়

একটা জ্যান্ত গণ্ডার ধরে গুজরাটের অন্তর্গত কাম্বের রাজা পর্তুগালের রাজাকে উপহার পাঠিয়েছিলেন। বনে বনে অনেক গণ্ডার—কাজেই ভারতে যাঁরা পর্যটনে এসেছিলেন, তাঁদের ভ্রমণবৃত্তান্তে গণ্ডার সম্বন্ধে বিস্তর উল্লেখ পাওয়া যায়।

পর্যটক ছাড়া শিকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গণ্ডাররা। তাদের মারতে মারতে শিকারীরা যখন প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে, তখন ভারতীয় বনবিভাগ তাদের সংরক্ষণের জন্য তৎপর হলেন। উত্তরবঙ্গের জলদাপাড়া ও আসামের কাজিরাঙ্গায় মোট প্রায় পাঁচশোর মত গণ্ডার বনবিভাগের রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় রয়েছে। বনবিভাগ তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য যতই তৎপর হোক, শিকারীরা সুযোগ পেলেই তাদের শিকার করে। কাজেই বনবিভাগকে সর্বদাই সতর্ক থাকতে হচ্ছে—বনের প্রহরীরা সর্বদাই বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে গণ্ডারগুলোকে পাহারা দিচ্ছে।

ভারতীয় গণ্ডার এক শিংওয়ালা—এ ধরনের গণ্ডার নেপাল, বর্মা ও সুমাত্রাতেও আছে। দু'শিংওয়ালা গণ্ডার দেখা যায় আফ্রিকার জঙ্গলে মিজো পাহাড়ে দু' শিংওয়ালা গণ্ডার দেখা যেত—কিন্তু ১৯৩৫ সালের পর তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আফ্রিকার দু'শিংওয়ালা গণ্ডার দু'জাতের হয়ে থাকে। এক জাতের গণ্ডার আকারে অপেক্ষাকৃত বড়, রঙে সাদা এবং স্বভাবে নিরীহ। শিকারীদের দেখে তেড়ে আসে না বলেই সহজে তারা মারা পড়ে। মারতে মারতে তাদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। নীল নদের পশ্চিম অঞ্চল ও জুলুল্যাণ্ড ছাড়া আর কোথাও সাদা গণ্ডার দেখা যায় না। অন্য জাতের গণ্ডারের রঙ কালো। স্বভাবে সে হিংস্র—সামান্যতম প্ররোচনাতেই তেড়ে আসে। কিন্তু ক্ষীণ দৃষ্টির জন্য যাকে সে তাড়া করে, তার নাগাল সে সহজে পায় না। সাদা ও এক শিংওয়ালা গণ্ডারের দৃষ্টিও ক্ষীণ। দৃষ্টি যেমন ক্ষীণ, বুদ্ধিতেও তেমনি দীন। কাজেই তাদের হিংস্রতা যতই উগ্র হোক না কেন, শিকারীরা সহজেই তাদের কাবু করে ফেলে।

সাদা গণ্ডারের সাদা রঙ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কোন কোন বন-বিশেষজ্ঞের মতে সাদা গণ্ডার আদপেই সাদা নয়। ডোবা বা নদীর ধারে কাদাতে গড়াগড়ি খেয়েই নাকি তাদের গায়ের রঙ সাদা হয়ে ওঠে। কিন্তু কাদায় মাখামাখি করতে কালো রঙের গণ্ডারও ভালবাসে। জলদাপাড়া ও কাজিরাঙ্গার বনে ডোবার মধ্যে গণ্ডারদের গা ডোবাতে দেখা গেছে। তথাপি তাদের গায়ের কালো রঙকে সাদা বলে ভুল হয় না। কাজেই ধরে নিতে হয় যে সাদা গণ্ডারের গায়ের রঙ কিঞ্চিৎ ফিকে। তার দরুন কাদার প্রলেপ মেখে তার রঙ হয়ে ওঠে সাদাটে।

সাদা হোক কালো হোক, শিংয়ের সংখ্যা দুই বা এক যাই হোক না কেন, গণ্ডারকে সুন্দর কেউ বলবে না। হঠাৎ দেখলে তাকে বীভৎস ও কদাকার বলেই মনে হবে। তার খাটো পা, লম্বা মুখ, ক্ষুদে চোখ ও মোটা চামড়া দিয়ে ঢাকা

দেহ দেখে মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন জন্তু মাটিতে চাপা পড়া ফসিলের স্তূপ থেকে জীবন্ত রূপ নিয়েছে। আকারে অতিকায় নয়—কিন্তু ওজন প্রায় দেড় থেকে পোনে দুই টন। গণ্ডারের দেহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার চামড়া। এমন শক্ত, মোটা ও পুরু চামড়া অন্য কোন জন্তুর নেই। আফ্রিকার গণ্ডারের চেয়েও পুরু হচ্ছে ভারতীয় গণ্ডারের চামড়া—তার দেহের দু'পাশে দু'ভাঁজ হয়ে থাকা চামড়া অনেকটা ঢালের মত দেখতে হয়।

ঘাসবনের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় জীপ থামাল বনবিহারী। জীপ থেকে নেমে ঘাসের মধ্যে ঝুঁকে পড়ে কী যেন পরীক্ষা করে সে।

জীপ থেকে নেমে আমিও তার পাশে গিয়ে দাঁড়াই। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে একটা বড়ো শুকনো বিষ্ঠার স্তূপ দেখতে পাই। বনবিহারী ফিসফিসিয়ে বললে, গণ্ডারের গোবর। গণ্ডারের স্বভাব হচ্ছে একই জায়গায় মল ত্যাগ করা—কাজেই আমার মনে হচ্ছে এখানেই কাছাকাছি কোথাও গণ্ডারগুলো রয়েছে।

তারপর চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করে হঠাৎ চাপা উচ্ছ্বসিত স্বরে সে বলে উঠল, ঐ যে এরণ্ড গাছ রয়েছে—অনেকগুলো এরণ্ড গাছ ঘন ঝোপ সৃষ্টি করেছে

এরণ্ড গাছ রয়েছে তো কী!—আমি অবাক হয়ে বললাম।

—গণ্ডার এরণ্ড গাছের পাতা খেতে ভালবাসে। সাধারণতঃ অবশ্য ওরা ঘাসই খায়, কিন্তু মাঝে মাঝে মুখ বদলাতে গাছের পাতা চিবোয়। প্রায় সবরকম গাছের পাতা চিবোলেও এরণ্ড গাছের পাতায় ওদের বিশেষ পক্ষপাত রয়েছে। এই গোবরের স্তূপ, কাছেই এরণ্ড গাছ—কাজেই আমার মনে হচ্ছে যে ওরা এখন এখানেই আছে এবং কাছাকাছিই রয়েছে।

এখানে ঘাসবন যথেষ্ট ঘন। তার মধ্যে এরণ্ড গাছগুলো আরও ঘন হয়ে জড়াজড়ি করে রয়েছে। এরণ্ড গাছের ঝোপের দিকে তাকাতেই আমার সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে। বনবিহারী অবশ্য আমার মত ভয় পায় না—কিন্তু তার হাবভাবে বোধ হল যে সে-ও রীতিমত বিচলিত হয়েছে।

ইতিমধ্যে জীপ থেকে বনবিহারীর ফরেস্ট গার্ড নেমে এসেছে। বিষ্ঠার স্তূপ পরীক্ষা করে সে এরণ্ড গাছের ঝোপের দিকে এগিয়ে যায়। সেখানে সে মাটির ওপরে উবু হয়ে বসে কী যেন দেখতে থাকে।

কী দেখছ খড়্গবাহাদুর?—বনবিহারী উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করল!

গণ্ডারের পায়ের ছাপ হুজুর, খড়্গবাহাদুর জবাব দিল: তার সঙ্গে শিকারীদের বুটের চিহ্নও রয়েছে। মনে হচ্ছে শিকারীরা গণ্ডারদের তাড়া করেছিল। দু-দুটো গণ্ডার হুজুর। একটা বড়, অন্যটা ছোট—বোধহয় একটা মাদী গণ্ডার তার বাচ্চাকে নিয়ে এখানে এসেছিল...

সঙ্গে সঙ্গে এরণ্ড গাছের ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল বনবিহারী। ভয়ের দরুন প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করলেও শেষপর্যন্ত আমিও গেলাম ওখানে। বনবিহারী ও খড়্গবাহাদুরের দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাসের নীচে নরম মাটির ওপরে কিছু পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। পায়ের ছাপ এতই অস্পষ্ট যে দেখে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

খড়্গবাহাদুর বললে, আমার মনে হচ্ছে গণ্ডার দু'টো পালিয়েছে এখান থেকে—হয়ত শিকারীদের তাড়া খেয়েই পালিয়েছে।

বনবিহারী গম্ভীর মুখে বললে, আমারও তাই মনে হচ্ছে—চল এখান থেকে চলে যাই আমরা।

আবার জীপে চেপে বসলাম আমরা। বনবিভাগের কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে যাই। ঘাসবনের পাশে পাহাড়। লাম্পাতি ও শিরীষ গাছের ঘন আচ্ছাদনের দরুন পাহাড়ের রঙ হয়েছে ঘন সবুজ। নীচু পাহাড়ের পেছনে উঁচু পাহাড় মেঘের স্তর ভেদ করে উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে।

আমরা সোজা পূর্ব দিকে যেতে যেতে পেরিয়ে আসি ভুটান রাজ্যের সীমা। এর পর শুরু হয় 'রেতি'-র জঙ্গল। রেতির জঙ্গলের ফরেস্ট গার্ডের কাছে খবর পাওয়া গেল যে দু'টো গণ্ডার জলদাপাড়ার দিক থেকে এসেছিল এদিকে, তারপর গিয়েছিল সার্মাচর দিকে—এখন আবার তারা ফিরে যাচ্ছে জলদাপাড়ার দিকে। কেনই বা এল, আবার কেনই বা ফিরে যাচ্ছে তা অবশ্য সে বুঝতে পারেনি। কোন শিকারী বা শিকারীর দল তাদের তাড়া করেছে কি-না তাও জানে না সে। এ পথে জীপে চেপে চা-বাগানের লোকজনেরা মাঝে মাঝে যাতায়াত করে থাকে. তাদের মধ্যে কারুর শিকারের মতলব আছে কি-না বোঝা মুশকিল।

ফরেস্ট গার্ডের বক্তব্য শোনার পর বনবিহারী বললে. গণ্ডার দু'টো আবার ফিরে গিয়েছে জলদাপাড়ার দিকে। স্বেচ্ছায় যেমন আসে নি, তেমনি নিজের ইচ্ছেমত ফিরেও যাচ্ছে বলে মনে করি না আমি। আমার বদ্ধমূল ধারণা শিকারীদের তাড়া খেয়েই আবার তারা ফিরে যাচ্ছে জলদাপাড়ার দিকে।

এখন কী করবে ?—আমি প্রশ্ন করলাম।

—যাব জলদাপাড়ার দিকে। ঐ শিকারীদের খপ্পর থেকে যে করে হোক ওদের বাঁচাতেই হবে।

গণ্ডারদের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে আমরা ঢুকলাম গভীরতর বনের মধ্যে। তারপর পেরিয়ে গেলাম তোরসা নদী। ক্রমশঃ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, রাত হয়—বনের মধ্য দিয়ে কোথায় যাচ্ছি তা আমি বুঝতে পারি না। বনবিহারীকে প্রশ্ন করতে সে জবাব দিল, জলদাপাড়ার জঙ্গলের উত্তর দিকে আছি আমরা—কাছেই গরুমারা। ভাবছি গরুমারার ফরেস্ট বাংলোতে রাত কাটাব।

সেই ভাল স্যার—খড়্গবাহাদুর বললেঃ রাতের আঁধারে তো আর ঐ গণ্ডার বা শিকারীদের হদিস পাবেন না।

—তা পাব না। কিন্তু অন্ধকারের সুযোগ নিয়েই হয়তো এই শিকারীরা মেরে বসবে গণ্ডার দু'টোকে···

একটা পাহাড়ী নদীর ধারে মাটির ঢিবির ওপরে বনবিভাগের বিশ্রামগৃহ। ঢিবির একদিক খুব খাড়া, অন্য তিন দিকে পরিখা কাটা রয়েছে। বিশ্রামগৃহের চারপাশে বাগান। বাগানের গাছপালা অবশ্য চারপাশের বনের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

সারাদিন বনের মধ্যে অবিশ্রান্ত ঘোরাঘুরি করার ফলে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম আমরা। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে শোবার ঘরে ঢুকে পড়লাম দু'জনে। পাশাপাশি দু'টো নেয়ারের খাটে শুয়ে পড়লাম আমরা—শুয়ে পড়তেই ঘুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি খেয়াল নেই, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল চৌকিদারের চিৎকার শুনে। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি যে বনবিহারী বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে দিয়েছে। দরজা খুলতেই ঘরে এসে ঢুকল বিশ্রামগৃহের চৌকিদার অর্জুনরাই। হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তেজিত স্বরে সে বললে, সাংঘাতিক একটা কাণ্ড হয়েছে স্যার···লোকটা বাঁচে কি-না সন্দেহ···

কী হয়েছে অর্জুনরাই ?—বনবিহারী চোখ বড়ো বড়ো করে তাকাল চৌকিদারের দিকেঃ কে এই লোকটা ? কি হয়েছে ওর ?

—গণ্ডারে গুঁতিয়েছে ওকে। মাদী গণ্ডারটাকে গুলি করে মেরে ফেলে লোকটা তার শিংটাকে কেটে ফেলার মতলবে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল—এমন সময় বাচ্চা গণ্ডারটা তেড়ে এসে ওকে আক্রমণ করে···

—খুবই সৎকাজ করেছে গণ্ডারের বাচ্চাটা। কিন্তু তার সাহস ও গায়ের শক্তি তো কম নয়—একজন জোয়ান শিকারীকে মেরে কাবু করে ফেলেছে।

—বাচ্চা হলেও খুব ছোট নয় হুজুর। আকারে মাদীটার প্রায় অর্ধেক হবে। উঁচু প্রায় তিন ফুট, লম্বা সেই অনুপাতে। শিং প্রায় মাদীটার সমান হবে···

—লোকটাকে একেবারে মেরে না ফেলে ছেড়ে দিল যে গণ্ডারের বাচ্চাটা ?

—ওর সামনে একটা বুনো হাতি এসে দাঁড়ালো যে—দাঁতালো গুণ্ডা হাতি ! তখন লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে গণ্ডারের বাচ্চাটা ঐ গুণ্ডা হাতিটাকে আক্রমণ করেছে···এখনও চলছে হাতি ও গণ্ডারের লড়াই···

আশ্চর্য সাহস তো বাচ্চা গণ্ডারটার !—আমার চোখ দু'টি বিস্ফারিত হয়ে উঠলঃ বুনো গুণ্ডা হাতির সঙ্গে লড়াই !

বনবিহারী বললে, বুনো জন্তুজানোয়ারদের মধ্যে সবচেয়ে দুঃসাহসী হচ্ছে

গণ্ডার—কাউকেই সে ভয় পায় না!

—দেখবে নাকি হাতি-গণ্ডারের লড়াই?

—দেখবার ইচ্ছে তো খুব, কিন্তু তার আগে এই লোকটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

তারপর সে অর্জুনরাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, লোকটাকে এখানে নিয়ে এল কে?

ওর লোকজনেরা হুজুর,—অর্জুনরাই জবাব দিলঃ বাচ্চা গণ্ডারটা গুণ্ডা হাতিটাকে আক্রমণ করতেই তারা তাকে একটা খাটিয়ার ওপরে শুইয়ে নিয়ে এসেছে এখানে।

—জঙ্গলের মধ্যে ওরা খাটিয়া পেল কোথায়?

—বাঁশ কেটে বানিয়ে নিয়েছে হুজুর।

অর্জুনরাইকে অনুসরণ করে আমরা চলে এলাম বিশ্রামগৃহের বারান্দায়। সেখানে একটি খাটিয়ার ওপরে শুইয়ে রাখা রক্তাক্ত মানুষটাকে দেখে শিউরে উঠলাম আমি।

লোকটার সঙ্গীরা আমাদের দিকে এগিয়ে এসে মিনতি-মাখানো স্বরে বললে, ওকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন হুজুর—নইলে ওকে বাঁচানো যাবে না।

বনবিহারী বললে, ব্যবস্থা তো তোমরাই করতে পারতে—তোমাদের একটা জীপ আছে না!

একজন খাকী পোশাক-পরা নেপালী যুবক বললে, থাকলে কী হবে স্যার—আপনার লোকজনেরা গাড়িটাকে আটক করে রেখেছে…আমাদেরও অবশ্য ছেড়ে দেয়নি…

—তোমাদের ছেড়ে দেবে কী হে—'পোচার'-দের পুরো একটা গ্যাংকে ধরে ফেলার এমন সুবর্ণসুযোগ তো সচরাচর ঘটে না আমাদের··

—ধরেছেন বেশ করেছেন স্যার, কিন্তু আমাদের শিকারীবাবুকে হাসপাতালে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দিন তাড়াতাড়ি।…

বনবিহারী তার ড্রাইভারকে ডেকে আহত লোকটাকে লাটাগুড়ির হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললে।

আহত লোকটাকে নিয়ে জীপ চলে যেতেই বনবিহারী নেপালী যুবকটিকে বললে, এবারে বল তোমাদের কথা। তোমরাই তো গণ্ডার দু'টিকে তাড়া করে সামচি পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলে?

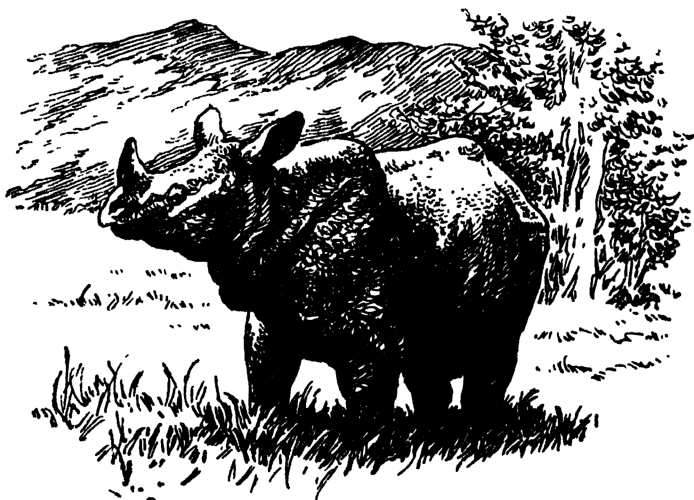
হ্যাঁ হুজুর,—নেপালী যুবকটি জবাব দিলঃ ভেবেছিলাম ভুটানের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ওদের মারব—কিন্তু আপনি ওখানে পৌঁছে যাওয়াতে তা আর পেরে

উঠলাম না। তাই ওদের তাড়া করে আবার নিয়ে এলাম জলদা-পাড়ার রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে। জানলেন হুজুর, আশ্চর্য এই গণ্ডারটার সন্তান-স্নেহ—এক সেকেণ্ডের জন্যও তার বাচ্চাটাকে চোখের আড়াল হতে দিত না। বাচ্চাটা অবশ্য শিশু নয়—শিংয়ের মাপ দিয়ে বিবেচনা করলে তাকে বড় বলেই ধরে নিতে হয়···

বনবিহারী আমার দিকে তাকিয়ে বললে, পুরোপুরি বড়ো না হওয়া পর্যন্ত সন্তানকে গণ্ডারী তার নিজের কাছেই রাখে। সন্তান যাতে চোখের আড়াল না হয়, তার জন্য সে তাকে তার সামনে রাখে সর্বদা। এই জলদাপাড়ার জঙ্গলে বহুবার দেখেছি, গণ্ডারের আগে আগে তার বাচ্চা চলেছে···

তারপর নেপালী যুবকটির দিকে তাকিয়ে বনবিহারী বললে, এবার বল কীভাবে মারলে তোমরা গণ্ডারীটাকে।

মেরেছেন আমাদের শিকারীবাবু হুজুর,—নেপালী যুবকটি বললে : সন্ধ্যা নাগাদ গণ্ডারীটা ক্লান্ত হয়ে এখান থেকে প্রায় একশো গজ দূরে একটা জলার ধারে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম করছিল—শিকারীবাবু তখন তাঁর জীপ থেকে গুলি করে মারলেন তাকে।



ঘাড়ের কাছে তাক করে পর পর তিনটে গুলি করলেন তিনি তাঁর রাইফেল দিয়ে —গর্জন করে উঠে দু-একবার লাফ দেবার চেষ্টা করেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল গণ্ডারীটা। তারপর আরও দু'বার গুলি করে ওকে একেবারে শেষ করে ফেললেন তিনি।

তারপর ?—রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলাম আমি।

তারপর জীপ থেকে নেমে এসে শিকারীবাবু গণ্ডারীটার দিকে এগিয়ে গেলেন

কুকরি হাতে নিয়ে,—নেপালী যুবকটি বলে চলে ঃ তাঁর মতলব ছিল, তাড়াতাড়ি গণ্ডারীটার নাকের ওপর থেকে শিং কেটে নেবার। কিন্তু গণ্ডারীটার পাশে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে ছিল বাচ্চা গণ্ডারটা, সে তেড়ে এসে শিং দিয়ে গুঁতিয়ে দিল শিকারীবাবুকে। পর পর তিন-চারবার তার শিঙের গুঁতো খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন শিকারীবাবু। এর পর হয়তো সে তার শিং দিয়ে তাঁর শরীরটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিত, যদি না ঐ বুনো হাতিটা এসে হাজির হত···

বুনো হাতিটা তোমাদের শিকারীবাবুর পোষা নাকি ?—আমি প্রশ্ন করলাম।

—না হুজুর। বুনো হাতিটাও ঐ শিকারীবাবুর দিকেই তেড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু বাচ্চা গণ্ডারটি মনে করল বুঝি সে তাকেই আক্রমণ করতে যাচ্ছে—কাজেই সে রুখে দাঁড়িয়ে তাকে আক্রমণ করেছে···সাংঘাতিক লড়াই হচ্ছে দু'জনের মধ্যে···

বনবিহারীর দিকে তাকিয়ে বললাম, চল দেখে আসি হাতি ও গণ্ডারের লড়াই।

না না হুজুর—নেপালী যুবকটি শিউরে উঠে বললে ঃ ওমুখোও হবেন না এখন। গণ্ডারের নজর বেশীদূর পর্যন্ত না গেলেও বুনো হাতির চোখে পড়ে যাবেন ঠিক, তখন আর রক্ষে থাকবে না···

হাতি ও গণ্ডারের লড়াই থামল প্রায় দশ ঘণ্টা বাদে। তারপর বনবিহারীর সঙ্গে ডোবার ধারে গেলাম আমি।

ডোবার ধারে ঘাসবনের মধ্যে যেখানে হাতির সঙ্গে গণ্ডারের লড়াই হয়েছিল, সে জায়গাটি দেখলাম আমরা। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঘাসের চাপড়াগুলি সব পিষে গিয়ে কাদা ও মাটির সঙ্গে মাখামাখি হয়ে পড়েছে। জায়গায় জায়গায় চাপ চাপ রক্ত মাটির সঙ্গে মিশে আছে। একটি কাঁটাঝোপের পাশে পড়ে আছে একটি হাতির দাঁতের টুকরো ও গণ্ডারের চামড়ার একটি বিচ্ছিন্ন অংশ। চামড়াটিকে দেখাচ্ছিল একটি ঢালের মত। ঝুঁকে পড়ে পরিক্ষা করতে করতে বনবিহারী বললে, গণ্ডার ও হাতি দু'জনেই দু'জনকে জখম করেছে—মনে হচ্ছে কেউ কারুর কাছে হার মানে নি।

আমি বললাম, কেউ কারুর কাছে হার না মানলে লড়াই থামল কী করে ?

যুদ্ধের পর সন্ধি হয়ে গিয়েছে বোধ হয়। মৃদু হেসে বললে বনবিহারী।

গণ্ডারের সঙ্গে হাতির সন্ধি !—আমি অবাক হয়ে বললাম।

—ব্যাপারটা অবাক হবার মত হলেও অসম্ভব নয়। আমাদের চোখের সামনে একটা প্রমাণও রয়ে গিয়েছে···

—প্রমাণ ?

—মাদী গণ্ডারটার মৃতদেহটা ওরা দু'জনে মিলে এখান থেকে সরিয়ে নিয়েছে —তার থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে দু'জনের মধ্যে ভাব হয়ে গিয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত নির্বাক বিস্ময়ে বনবিহারীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, তুমি জানলে কী করে যে হাতি ও গণ্ডার দু'জনে মিলে মাদী গণ্ডারের মৃতদেহটাকে সরিয়েছে? এমনও তো হতে পারে যে বাচ্চা গণ্ডারটিই তার মায়ের দেহটা এখান থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

অসম্ভব। ঐ বাচ্চা গণ্ডারটির পক্ষে একা তার মায়ের দেহটা এখান থেকে সরিয়ে ফেলা অসম্ভব ব্যাপার। ঐ হাতিটার সাহায্য ছাড়া এ কাজ সে করতেই পারত না···

বলতে বলতে মৃদুমন্দ হাসতে থাকে বনবিহারী।

বনবিহারীর কথা সেদিন পুরোপুরি বিশ্বাস করতে না পারলেও আমি আর কিছু বলিনি। তবে বুনো হাতি ও গণ্ডারের মধ্যে বন্ধুত্ব যে অসম্ভব নয়, তার প্রমাণ মাস দুয়েকের মধ্যেই পেয়েছিলাম।

মাস দুয়েক বাদে একদিন জলদাপাড়ার বনের একটি গণ্ডার প্রচণ্ড বৃষ্টিতে দিশেহারা হয়ে গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। তাকে সেই গর্ত থেকে উদ্ধার করেছিল একটি বুনো হাতি।

এই ঘটনাটির কথা শোনার পর আমার মনে হল, হয়তো বনবিহারীর অনুমান মিথ্যা নয়—হয়তো সত্যিই লড়াইয়ের পর ঐ বাচ্চা গণ্ডারটির সঙ্গে বুনো হাতিটার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল।

॥ বার ॥

গণ্ডারের মতই শক্তিশালী বুনো মোষ ও বাইসন। ক্ষিপ্ত হয়ে যখন তারা আক্রমণ করে, তখন গণ্ডারের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। এদের ভয়াবহ হিংস্রতার বহু বৃত্তান্ত আমরা দেশ-বিদেশের শিকার-কাহিনীতে পড়েছি। শিকারীরা এদের প্রসঙ্গ উঠলেই বলে যে, এরা মানুষ দেখলেই ক্ষিপ্ত হয়ে তেড়ে আসে, কাজেই এদের মেরে না ফেলে উপায় নেই।

বুনো মোষ বা বাইসন দেখামাত্র মেরে ফেলতে ফেলতে শিকারীরা যখন প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলল এদের, তখন টনক নড়ল বনবিভাগের। বনবিভাগের কর্তৃপক্ষ নির্দেশ জারি করলেন যে নির্বিচারে বুনো মোষ বা বাইসন মেরে ফেলা চলবে না—তাদের সংরক্ষণ করতে হবে।

কিন্তু সংরক্ষণযোগ্য প্রাণিদের তালিকাভুক্ত করলেই সংরক্ষণ সম্ভব হয় না, কারণ মানুষমাত্রেরই আত্মরক্ষার অধিকার আছে। শিকারীরাও মানুষ নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য তারা যদি তেড়ে আসা বুনো মোষ বা বাইসনকে মেরে ফেলে, তাতে বনবিভাগ ক্ষুব্ধ হলেও শিকারীদের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন না। কজেই শেষ পর্যন্ত ভারতীয় বনবিভাগের কর্তৃপক্ষ বুনো মোষ বা বাইসন অধ্যুষিত বনের মধ্যে শিকারীদের প্রবেশ পুরোপুরি নিষেধ করে দিয়েছেন।

শিকারকাহিনী এবং বুনো মোষ ও বাইসন শিকারীদের অভিজ্ঞতা থেকে আমার, এমন কি আমার শিকারী বন্ধু গোপীন ব্যানার্জীর ধারণা হয়েছিল যে বুনো মোষ ও বাইসন ভয়ঙ্কর রকম হিংস্র জানোয়ার—তাদের খপ্পরে পড়ামাত্র তাদের মেরে ফেলতে হবে, নইলে তাদের আক্রমণে মারা পড়ব আমরা। কিন্তু আমাদের এই ধারণা যে পুরোপুরি সত্য নয় তা আমরা বুঝতে পারলাম যোশীপুরে গিয়ে।

১৯৬৬ সালের মার্চ মাস।

যোশীপুরের ডাকবাংলোতে ক্যাম্প করে আছি আমি ও গোপীন।

যোশীপুর উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি ছোট শহর। শহর হিসাবে নগণ্য, কিন্তু কাছেই বিখ্যাত শিমলিপালের বন ও অভয়-অরণ্যের অবস্থানের দরুন যোশীপুরের নাম অরণ্যপ্রেমিক বা শিকারীদের কাছে অপরিচিত নয়। আমরা অবশ্য ওখানে শিকারের উদ্দেশ্যে যায়নি। শিমলিপালের বনাঞ্চলে

পাথরের স্তরের মধ্যে নাকি নিকেলের (Nickel) লক্ষণ দেখা দিয়েছে—তারই সন্ধানে এসেছি আমরা। যোশীপুরে আছি এই অরণ্য অভিযানের প্রস্তুতির জন্য। দিন কয়েকের মধ্যেই আমাদের অভিযানের আয়োজন সম্পূর্ণ হবে, তারপর প্রবেশ করব বনের মধ্যে।

শিকারের জন্য না এলেও স্থানীয় বনবিভাগের একজন অফিসারের সন্দেহ হল, বুঝি ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের নাম করে বাঘ শিকার করতে এসেছি আমরা। কারণ বাঘ শিকারী হিসেবে গোপীনের খ্যাতি তাঁর কানে এসেছে। মধ্যপ্রদেশের বনে বনে গোপীনের বাঘ শিকারের রোমাঞ্চকর বৃত্তান্ত তিনি শুনেছেন এবং তাঁর ধারণা বাঘ শিকারের নেশা গোপীনের অদম্য। সুযোগ পেয়েও সে বাঘ শিকার করবে না তা তিনি বিশ্বাস করেন না।

তাঁর এই সন্দেহের কথা তিনি একদিন ডাকবাংলোতে এসে গোপীনের কাছে স্পষ্ট প্রকাশ করে বসলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, দেখুন ব্যানার্জী-সাহেব, বাঘ-শিকার সম্বন্ধে বিধিনিষেধগুলো আজকাল আমাদের অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হচ্ছে। কারণ ভারত সরকার বাঘকে বাঁচাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। বাঘ মানুষখেকো হয়ে উঠলেও তাকে শিকার করার অনুমতি আজকাল আর সহজে দেওয়া যায় না।

গোপীন গম্ভীর মুখে বললে, আমি তো এখানে বাঘ শিকারের জন্য আসি নি মিস্টার জেনা। কোন রকম শিকারের মতলবই নেই আমার। আপনি মিস্টার রায়কে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন। আমরা দু'জনে—

গোপীনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জনক জেনা বললেন, জানি, আপনারা দু'জনে নিকেলের জন্য জিয়োলজিক্যাল এক্সপ্লোরেশন করতে এসেছেন। কিন্তু আপনার মত একজন বিখ্যাত শিকারী শিমলিপালের মত জঙ্গলে এসে কী শিকার না করে থাকতে পারবেন!

—বিশ্বাস করুন মিস্টার জেনা, শিকারের কোন নেশা আর নেই আমার।

—শিকারের নেশা কাটিয়ে ওঠা তো সহজ নয় মিস্টার ব্যানার্জী। এ এক সাংঘাতিক নেশা। তাছাড়া আমি চাই না যে, আপনার মত একজন দক্ষ শিকারী শিকার-টিকার সব ছেড়ে দেবেন। শিকার করুন, তবে বাঘ নয়, অন্য কিছু।

অন্য কিছু মানে!—গোপীন ভ্রূ কুঁচকে তাকাল জনক জেনার মুখের দিকে।

অন্য কিছু মানে বাঘের চেয়েও হিংস্র জন্তু।—গলার স্বর নামিয়ে বললেন জনক জেনা—ধরুন বুনো মোষ।

বুনো মোষ আছে নাকি এই জঙ্গলে ?—গোপীন চমকে উঠে বললে—আমি যতদূর জানি, হিমালয়ের তরাই অঞ্চল, বিশেষ করে আসামের অন্তর্গত মানসের বন ছাড়া আর কোথাও বুনো মোষ দেখা যায় না।

—দেখা যায় বইকি। মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার বনে বনে বুনো মোষের পালকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে। তবে তরাইয়ের বনের তুলনায় এদিকে সংখ্যায় এরা বেশী নয়। বড় জোর শ'খানেক বুনো মোষ মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার বনে আছে। শিমলিপালের বনে অবশ্য একটি মাত্র বুনো মোষের খবর পেয়েছি। দলছুট হয়ে এই বনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে সে। কিন্তু সংখ্যায় একটিমাত্র হলেও দারুণ সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে সে।

গোপীন অবাক হয়ে বললে, বনের মধ্যে একটি মাত্র বুনো মোষ, তাকে মেরে ফেলতে চান আপনি!

কে বললে আমি মেরে ফেলতে চাই!—জনক জেনা চমকে উঠে বললেন—ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসার আমি, সংরক্ষিত বনের এলাকায় কোন বন্য জন্তুকে আমি মেরে ফেলতে চাইব, সে কি হয় ব্যানার্জীসাহেব!

—কিন্তু আপনি তো স্পষ্ট আমাকে বললেন যে, আমি যদি শিকার করতে চাই, বাঘ না শিকার করে ঐ বুনো মোষটাকে—

আপনি ঠিক আমার কথা বুঝতে পারেন নি ব্যানার্জীসাহেব।—জনক জেনা বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—আমি বলতে চাইছিলাম যে, একান্তই যদি শিকার না করে থাকতে না পারেন, ঐ বুনো মোষটাকে শিকার করুন। আমাদের বন-বিভাগের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী অবশ্য মোষ শিকারের অনুমতি দিতে পারব না আপনাকে, তবে আপনি যদি বুনো মোষটাকে মারেন তো আমি আমার ওপর-ওয়ালাদের কাছে কোন রিপোর্ট পাঠাব না।

মৃদু হেসে গোপীন বললে, বুনো মোষটার ওপরে খুব ক্ষেপে গিয়েছেন মনে হচ্ছে।

—ক্ষেপে আমি যাইনি ব্যানার্জীসাহেব, ক্ষেপেছে বনের মানুষরা। ক্ষেপেছে বললে ঠিক বলা হবে না, রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। এখান থেকে প্রায় মাইল বার দূরে ঘন ঘাসবনের মধ্যে একদল মুণ্ডা তাদের মোষের পাল নিয়ে বাস করে। মোষের পাল মানে বুনো মোষের পাল নয়, গৃহপালিত কুড়িটা মোষ। ঐ দলছুট বুনো মোষটা হঠাৎ একদিন ওখানে হাজির হয়ে ওদের ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলে এবং মোষের পালটাকে আক্রমণ করে।

—বিশ বিশটা মোষকে মেরে ফেলেছে বুঝি ঐ বুনো মোষটা?

—না, তা নয়। বিশটা মোষের মধ্যে তিনটে ছিল পুরুষ মোষ, তাদের সে মেরে ফেলেছে।

—বিশটা মোষের মধ্যে মাত্র তিনটে পুরুষ মোষ!

—বাছুরদের মধ্যে কিছু পুরুষ মোষ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তাদের আমি ধরছি না। বিবেচনা করে দেখুন ব্যানার্জীসাহেব, মাত্র একটি বুনো মোষ তিনটি

জোয়ান বয়সী মোষকে শেষ করে ফেলেছে! জানলেন ব্যানার্জীসাহেব, বুনো মোষ ইচ্ছে করলে একটা বড়ো আকারের বাঘকেও কাবু করে ফেলতে পারে। তাই বাঘও ভয় পায় তাকে রীতিমত।

আমি বললাম, বুনো মোষটা স্ত্রী মোষ বা বাছুরদের ওপরে হামলা করে নি?

জনক জেনা জবাব দিলেন, না, কারণ সে নিজে পুরুষ মোষ। পুরুষমোষ বা পুরুষ হাতি কখনো স্ত্রী মোষ বা স্ত্রী হাতির ওপরে হামলা করে না। এই বুনো মোষটা পুরুষ মোষ তিনটিকে মেরে ফেলে ঐ মোষের পালের দলপতি হয়ে বসেছে।

আমি বললাম, বুনো মোষ গৃহপালিত মোষের পালের দলপতি হয়ে বসেছে? আশ্চর্য ব্যাপার!

—আশ্চর্য হলেও সত্য। শুনলাম গৃহপালিত স্ত্রী মোষগুলো ঐ বুনো মোষটাকে রীতিমত সমীহ করতে শুরু করেছে।

গোপীন বললে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ বুনো মোষ পোষা মোষের চেয়ে আকারে বড়, বেশী শক্তিমান ও সুন্দর। তাছাড়া স্ত্রী মোষগুলোর চোখের সামনে তিনটে পুরুষ মোষকে একা সে ঘায়েল করেছে—কাজেই স্ত্রী মোষগুলোর চোখে সে রীতিমত একজন "হিরো"। জন্তু জানোয়ারদের মধ্যে দেখা যায়, স্ত্রীজাতীয় জন্তু শক্তের ভক্ত।

জনক জেনা বললেন, ঠিক বলেছেন মিস্টার ব্যানার্জী। ঐ পোষা স্ত্রী মোষগুলো বুনো মোষটির শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজেদের দলপতি করে নিয়েছে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, মোষগুলো যাদের পোষা, তারা তাদের মোষগুলোর কাছে ঘেঁষতে পারছে না। আগে দিনে প্রায় আধমণ করে দুধ পেত তারা মোষগুলো দুয়ে, এখন এক ফোঁটাও পাচ্ছে না। জমিজমা ওদের কিছু নেই, ওদের বেঁচে থাকার সংস্থান হয় মোষের দুধ বেচে। কাজেই ঐ বুনো মোষটাকে না মারলে ওরা মারা পড়বে বলে আমার ধারণা।

তাহলে অবশ্যই ঐ বুনো মোষটাকে মেরে ফেলা উচিত—গোপীন গম্ভীরমুখে বললে—চলুন, মিস্টার জেনা, যেখানে ঐ বুনো মোষটা আছে সেখানে নিয়ে চলুন আমাদের।

জনক জেনা মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারব না ব্যানার্জীসাহেব। মানে ইয়ে, ঐ বুনো মোষটাকে মারার অনুমতি তো দিতে পারব না। আমার সামনে আপনি যদি মোষটাকে মারেন, আমি একটু অসুবিধেয় পড়ে যাব। কাজেই—

—ঠিক আছে, আপনাকে যেতে হবে না আমাদের সঙ্গে। আপনি শুধু আমাদের পথ বাতলে দিন।

—পথ বাতলাবার জন্য একজন লোককে আপনাদের সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি

ব্যানার্জীসাহেব। সে আপনাদের ওখানে নিয়ে যাবে। এখান থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল যেতে হবে আপনাদের। গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাতির পায়ে চলা পথ আছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কন্‌ট্রাক্টররা পথটাকে মোটামুটি জীপ চালাবার উপযোগী করে তুলেছে।

—ঠিক আছে, কালই যাব ওখানে। আপনি লোকটাকে পাঠিয়ে দেবেন মিস্টার জেনা।

যে লোকটাকে জনক জেনা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন সে একজন সত্তর বছরের বুড়ো। বহু বছর আগে ময়ূরভঞ্জের মহারাজার শিকার-অভিযানে পথ-প্রদর্শকের কাজ করত। শিমলিপালের বনের প্রতিটি অঞ্চলের সঙ্গে ওর নিবিড় পরিচয় আছে।

লোকটার নাম দইতারি মাহাতো। বৃদ্ধ হলেও তার দেহের মাংশপেশীগুলো এতটুকু শিথিল হয় নি। মাথার চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেলেও মুখের চামড়া নিভাঁজ। চোখের দৃষ্টি প্রখর—জ্বলজ্বল করছে কালো চোখের তারাদু'টি। গোপীনকে সে বললে, কিছু ভাববেন না হুজুর, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পৌঁছে দেব আপনাদের কিটাবুরু পাহাড়ে।

পাহাড়ের উপরে উঠতে হবে নাকি আমাদের ?—গোপীন প্রশ্ন করল।

—না হুজুর। পাহাড়ের নীচেই ঐ মুণ্ডারা থাকে।

—আর মোষের পাল ?

—তারা ঐ পাহাড়ের নীচে ঘাসবনের মধ্যে চরে বেড়ায়।

খুব গভীর বনের মধ্যে পথটা যেন বনটাকে চিরে এগিয়ে গিয়েছে। সরু রাস্তা, জীপের মধ্যে বসে হাত বাড়ালেই বন ছোঁয়া যায়। শাল, পিয়াশাল, আসাম, মহুয়া, জাম প্রভৃতি গাছ ছাড়া নানা ধরনের বুনো লতা বনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। লতাঝোপগুলো বনকে যেন আরও ঘন করে তুলেছে।

মাইল কয়েক এগিয়ে যেতে শুরু হল চড়াই। চড়াইয়ের পর উৎরাই। একটার পর একটা পাহাড় পেরিয়ে চলেছি। একটানা দু'ঘণ্টা পথ চলার পর একটা ঘাসবনের কাছে পৌঁছলাম আমরা। এখানে কয়েকটি কাশ ও ঘাশের খুপরি চোখে পড়ল। দইতারি মাহাতোর ইঙ্গিতে জীপ থামিয়ে আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম।

আমরা গাড়ি থেকে নামতেই কয়েকজন নেংটিপরা কালো বলিষ্ঠ গড়নের মানুষ আমাদের ঘিরে ফেলল। তাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে দইতারি মাহাতো বললে, ব্যাপার কী, তোমরা জামা-কাপড় খুলে নেংটি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন।

দলের নেতা দইতারির দিকে তাকিয়ে মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে বললে, বুনো

মোষটা আমাদের জামা-কাপড় সইতে পারছিল না, তাই জামা-কাপড় ছেড়েছি।

—এখন আর বুঝি তোমাদের দেখে তেড়ে আসছে না?

—না।

—ভারি মজার ব্যাপার তো!

গোপীনের উড়িয়াভাষা জানা আছে। সে দলের নেতার দিকে চেয়ে বললে, বুনো মোষটা তো তোমাদের ঘড়বাড়িও সইতে পারছিল না।

দলের নেতা বললে, হ্যাঁ হুজুর, আমাদের কুঁড়ে ঘরগুলি সে ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। এই দেখুন না, কাশের ও ঘাসের খুপরি বানিয়ে বাস করছি আমরা।

—আর ঘর বানাবে না তোমরা?

—না হুজুর, বানালেই আবার ও ভেঙে ফেলবে।

—মোষটা ভারি উপদ্রব করছে তো তোমাদের ওপরে।

—উপদ্রব নয় হুজুর, ঐ ওর স্বভাব।

—কোথায় মোষটা? ওকে আমি দেখতে চাই।

—মোষটা আমাদের পোষা মোষগুলোর সঙ্গে ঘাসবনের মধ্যে চরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু দেখার চেষ্টা করবেন না, আপনাদের দেখলেই ও ক্ষেপে যাবে।

—দূর থেকে দেখা যাবে না? আমাদের সঙ্গে দূরবীন আছে।

—দূরবীন যখন আছে, ঐ টিলার ওপরে উঠুন, দাঁড়িয়ে দেখতে পাবেন।

—টিলার ওপরে বন বড় ঘন বলে বোধ হচ্ছে। ওখানে ওঠার পথ কই?

—পথ আমিই আপনাদের দেখিয়ে নিয়ে যাব। আসুন আমার সঙ্গে।

—তুমি তো ওদের মোড়ল, তোমার নাম জানতে পারি?

—আমার নাম তুরাম হুজুর। আসুন আমার সঙ্গে।

তুরামকে অনুসরণ করে বুনো জন্তু-জানোয়ারদের পায়ে পায়ে তৈরী পথ ধরে আমরা টিলার ওপরে উঠে এসে দাঁড়ালাম।

টিলার মাথার ওপরে বন তেমন ঘন নয়। ওখানে একটা বড়ো পাথরের স্তূপের ওপরে দাঁড়িয়ে টিলার নীচে ঘাসবনটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

ঘাসবনের মধ্যে মোষের পাল আপনমনে চরে বেড়াচ্ছে। এদের মধ্যে কোন্‌টা বুনো মোষ বুঝতে পারছি না।

গোপীন প্রশ্ন করল, কোথা হে তুরাম, তোমাদের মোষের পালের মধ্যে বুনো মোষটাকে তো দেখতেই পাচ্ছি নে!

তুরাম মৃদু হেসে বললে, আমাদের মোষগুলির সঙ্গে মিলেমিশে আছে বলে ঠাহর পাচ্ছেন না হুজুর। মাদীগুলোর মধ্যে ও-ই একমাত্র পুরুষ মোষ। চোখে দূরবীন এঁটে দেখলেই বুঝতে পারবেন।

চোখে দূরবীন লাগিয়ে কয়েক সেকেণ্ড বেশ ভালো করে দেখে নিয়ে গোপীন বললে, হ্যাঁ, এইবারে দেখতে পাচ্ছি। সত্যিই খুব শক্তিশালী জানোয়ার।

গোপীনের কাছ থেকে দূরবীনটা নিয়ে আমি চোখে লাগালাম। পোষা গৃহপালিত মোষগুলোর মধ্যে বুনো মোষটাকে চিনে নিতে বিশেষ অসুবিধে হল না। আকারে সে পোষা মোষের-চেয়ে অনেক বড়। উচ্চতায় প্রায় সাড়ে ছ' ফুট। তার দেহ খুব বলিষ্ঠ ও মাংসবহুল—ওজন প্রায় এক টন হবে। গায়ের রং শ্লেটের মত কালো, হাঁটু থেকে নীচের অংশ ফ্যাকাশে সাদা। মাথার ওপরে প্রকাণ্ড শিং অর্ধচক্রাকারে বাঁকা হয়ে আছে।



শুনেছি, বুনো মোষ স্বভাবে খুব হিংস্র হয়ে থাকে। বাতাসে গন্ধ শুঁকে টের পায় কাছাকাছি কোন জন্তু-জানোয়ার বা মানুষ আছে কিনা। দূর থেকে সামান্য শব্দও এদের কান এড়ায় না। দৃষ্টিশক্তি প্রখর না হলেও গন্ধ ও শব্দ অনুসরণ করে তেড়ে আসে। আক্রমণের আগে ফোঁস ফোঁস শব্দ করে মাটিতে সজোরে পা ঠোকে। তারপর ধেয়ে আসে শিং উঁচিয়ে। তার কাছে বাঘও নাকি রেহাই পায় না। বুনো মোষের সঙ্গে লড়াইয়ে বাঘ সাধারণতঃ জিততে পারে না।

কিন্তু ঘাসবনের পোষা মোষদের পাশাপাশি চড়ে বেড়ানো ঐ বুনো মোষটার মধ্যে হিংস্রতার কোন আভাসই পাই নে। পোষা মোষগুলোর কাছে যেন সে পোষ মেনেছে। শান্তভাবে তাদের সঙ্গে ঘাস খাচ্ছে। একটু আগে বোধহয় সে কাছের ঐ ডোবার মধ্যে গড়াগড়ি খেয়েছে—তার কাদামাখা ভেজা গা দেখে তা-ই বোধ হচ্ছে।

গোপীন বললে, শুনলাম, ঐ বুনো মোষটাকে তোমরা নাকি মেরে ফেলতে চাও?

কে বললে হুজুর!—তুরাম চমকে উঠে বললে।

—যে-ই বলুক না কেন, ওকে মেরে না ফেললে তোমাদের চলবে কী করে!

গোপীনের মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড একদৃষ্টে চেয়ে তুরাম বললে, আমাদের মোষগুলো তো বুনো মোষটাকে ভালবাসে, তাই ওকে মেরে ফেলার কথা আমরা ভাবতেই পারি নে।

অবাক হয়ে তুরামের পানে তাকিয়ে গোপীন বললে, কিন্তু ও তো তোমাদের ঘর ভেঙেছে, তোমাদের মোষের পালের কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। ফরেস্ট অফিসার জনক জেনার কাছে শুনলাম যে, তোমরা নাকি এক ফোঁটা দুধও দুইতে পারছ না!

না হুজুর।—তুরাম গম্ভীর মুখে বললে—যা শুনছেন, ভুল শুনছেন। ঘরে ভেঙেছে ঠিকই, হয়তো আর আমাদের ঘর বানাতেও দেবে না, কিন্তু মোষদের কাছে আমাদের ঘেঁষতে দিচ্ছে না, এমন নয়।

মোষদের কাছে ঘেঁষতে পারছ তোমরা!—গোপীনের চোখদু'টি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

—শুধু যে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে তা নয়, দুধ দুইতেও দিচ্ছে।

—তাই নাকি? কিন্তু কি করে তা সম্ভব হল?

মুচকি হেসে দইতারি বললে, জামাকাপড় ছেড়েছে বলে বোধহয় বুনো মোষটা তাদের সমগোত্রীয় বলে ভাবতে শুরু করেছে ওদের!

গোপীন বললে তাই নাকি হে তুরাম?

তুরাম বললে, আমাদের জামাকাপড় ওরা সইতে পারছিল না ঠিকই, কিন্তু আমরা জামাকাপড় ছাড়তেই বুনো মোষটা যে আমাদের মোষ বলে ভাবতে শুরু করেছে তা নয় হুজুর।

—তাহলে কী?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তুরাম বললে, আমার মনে হয়, আমাদের মাদী মোষগুলো হয়তো বুনো মোষটাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, আমরা ওর শত্রু নই।

অবিশ্বাস্য হলেও কথাটা অবিশ্বাস করতে পরি না।

গোপীনের ঠোঁটের কোণে অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠলেও সে চুপ করে থাকে। আমার মতো সেও হয়তো অবিশ্বাস্য ব্যাপারটাকে পুরোপুরি অবিশ্বাস করতে পারছে না।

গোপীনের মুখের দিকে আমি চেয়ে বললাম, পোষা মোষের পাল বুনো মোষকে তাদের প্রতিপালকদের বন্ধু বলে মেনে নিতে বলছে, এ কী সম্ভব ?

মৃদু হেসে গোপীন বললে, অসম্ভব কী করে বলি বল ? বুনো মোষটা যে ওদের আর শত্রু বলে ভাবছে না এ তো সত্যি।

গোপীনের কথার ওপরে আর কিছু বলতে পারি না আমি।

আসল কথা কী জান,—গোপিন বলে চলে—আমরা সত্যিই যদি চাই, বনের পশুকেও পেতে পারি বন্ধু হিসাবে।

॥ তের ॥

শিমলিপালের বনে বুনো মোষের দেখা পেয়ে বন্য গরু বা বাইসন সম্বন্ধে আমার আগ্রহ হল। মোষের মত গরুরও বন্য সংস্করণ আছে নিশ্চয়ই। কারণ গরু চিরকাল মানুষের গৃহপালিত এমন হতে পারে না। বুনো গরুকে বন থেকে ধরে এনেই নিশ্চয়ই পোষ মানানো হয়েছে।

খোঁজ নিতে গিয়ে জানলাম যে বুনো গরু খুবই দুর্লভ প্রাণী। বছর পাঁচশেক আগে পর্যন্ত এ দেশের সব বনেই তারা ঘুরে বেড়াত। কিন্তু এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে।

এ দেশে শুধু নয়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই তারা লোপ পেতে বসেছে। অবশ্যম্ভাবী বিলোপের আশঙ্কায় উত্তর আমেরিকার তাদের কয়েকটিকে চিড়িয়াখানায় ধরে রেখে লালন-পালন করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

তেমন কোন চেষ্টা এদেশে হয়েছে বলে জানি না। গৃহপালিত গরুদের নিয়ে আমরা এতই বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত যে বুনো গরুদের নিয়ে মাথা ঘামাই নে। এদেশের বন বিভাগ এদের রক্ষণাবেক্ষণে যেমন উৎসাহিত নয়। বাঘ, চিতাবাঘ বা হাতিকে বাঁচাবার জন্য যে তৎপরতা দেখা যায়, তার সিকিভাগ চেষ্টাও দেখা যায় না এদের সংরক্ষণের ব্যাপারে।

তবে কোথাও কোথাও এদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছু কিছু চেষ্টা দেখা যায়। নেফাতে এদের ধরে পোষ মানানো হয়েছে। পোষ মানা এই বুনো গরুকে বলে 'মিথুন'। দক্ষিণ বর্মা ও মালয়েও বুনো গরুকে ধরে লালন-পালন করা হয়েছে। ওখানে পোষা বুনো গরুকে বলে 'সেলডাং'।

ধরে পোষ না মানিয়ে বুনো গরুকে বনের মধ্যে সংরক্ষণের একটা খবর পেয়েছিলাম মহীশূরের একটি বন থেকে। বনটা সংরক্ষিত বনের এলাকার মধ্যে অবস্থিত হলেও স্থানীয় 'কুরুবা'-দের তৎপরতাতেই বুনো গরুরা ওখানে সংরক্ষিত হয়েছে। নইলে বন বিভাগের সাধ্য ছিল না ওদের বাঁচিয়ে রাখার। কারণ বুনো গরু দুর্লভ বলে শিকারীরা তাদের শিকার করে আনন্দ পায়। বাগে পাওয়া বাঘকে ছেড়ে দিয়েও কোন কোন শিকারী বুনো গরুর পেছনে ধাওয়া করে। এদের কবলে পড়েই মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, উত্তরবঙ্গ ও আসামের বন থেকে বুনো গরুরা নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে।

কুরুবারা কী ভাবে বুনো গরুদের আগলে রাখে তার রিপোর্ট পেয়েছিলাম আমি

আমার বন্ধু দেবব্রত ঘোষের কাছ থেকে। সে তখন মহীশূরের বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ভূতাত্ত্বিক পরিক্রমার সূত্রে।

দক্ষিণ মহীশূরের পাহাড়ে জঙ্গলে নানা ধরনের মূল্যবান খনিজের ভাণ্ডার রয়েছে। সেগুলোর হদিস নিতে নিতে দেবব্রত এসে পৌঁছল বান্দিপুরের বনে। এখানে বন খুব গভীর এবং বনের একটা বড় অংশ 'গেম্‌স্ স্যাংচুয়ারি' অর্থাৎ অভয়-অরণ্যের এলাকার মধ্যে পড়েছে। এখানে ঘোরাঘুরি করার জন্য বন বিভাগ থেকে 'গাইড' বা পথ-প্রদর্শক নেবে কিনা ভাবছে দেবব্রত, এমন সময় তার আলাপ হল আর. সি. মরিস নামে একজন বন্য প্রাণী-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে। এককালে খুব নামকরা শিকারী ছিলেন মরিস। কিন্তু শিকার করতে করতেই বন্য প্রাণীদের প্রতি মমতা বোধ করতে শুরু করেন এবং তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকারী বন বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সুরু করেন। বান্দিপুরের বনেই তিনি বাস করেন। বনের প্রাণীদের কাছাকাছি থেকে তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হন। সরকারী বন বিভাগ ওখানে অভয়-অরণ্য গড়ে তুলেছে, কিন্তু বনের প্রাণীরা তাঁকেই তাদের অভয়দাতা বলে মনে করে। মরিস বনের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে শুরু করলে তারা তাদের বনের গোপন আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসে। তার কাছাকাছি ও পাশাপাশি তারা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়, কারণ তারা জানে যে, মরিস কাছে থাকলে শিকারীরা তাদের কাছে ঘেঁষতে সাহস পাবে না।

দেবব্রতর সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগে মরিস ভেবেছিলেন বুঝি সে শিকারের মতলবে এসেছে। কিন্তু আলাপ হতেই তাঁর ভ্রান্তি দূর হল এবং তিনি নিজেই বনের মধ্যে তার পথপ্রদর্শক হতে চাইলেন।

বান্দিপুরের বনের মধ্যে মরিসের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে করতে হাতি, বুনো শুয়োর, চিতাবাঘ, ভালুক এমনকি বাঘ ও বুনো মোষের দেখা পেল দেবব্রত। দেখে খুশী হয়ে সে বললে, বনে যারা থাকে তারা সকলেই দেখছি নির্ভয়ে আপনার কাছে চলে আসছে। ওদের পোষ মানালেন কী করে?

মৃদু হেসে মরিস বললেন, পোষ ঠিক মানাই নি, ওদের মন থেকে মানুষ সম্বন্ধে ভয় দূর করেছি। জানেন নিশ্চয়ই যে, এ বনে শিকারের মতলবে কেউ আসতে পারে না।

—তা তো পারবেই না। গেম্‌স্ স্যাংচুয়ারিতে শিকার পুরোপুরি নিষিদ্ধ নয় কি?

—যাদের শিকারের নেশা আছে, তারা কি আর নিষেধ মানতে চায়! বরঞ্চ নিষিদ্ধ এলাকাতেই তাদের শিকারের ঝোঁক বাড়ে। নিষেধের জন্য নয়, আমার ভয়ে এদিকে কোন শিকারী ঘেঁষতে সাহস পায় না। কারণ শিকারীরা জানে

যে, এখানে কেউ শিকারের চেষ্টা করলে আমি তাকে শিকার করে বসব।

—তার মানে বন বিভাগের হয়ে আপনিই বন্য প্রাণীদের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন?

—বন বিভাগের হয়ে নয়, আমার নিজের গরজেই আমি ওদের রক্ষণাবেক্ষণ করছি, কারণ ওদের আমি ভালবাসি। তবে বন বিভাগ তেমন তৎপর হলে আমাকে এমনি দিবারাত্রি বনের মধ্যে পাহারা দিতে হত না।

বান্দিপুরের বনের প্রায় সর্বত্র দেবব্রতকে নিয়ে যান মরিস। তাঁর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করতে করতে তার মনে হল বনের প্রতিটি গাছপালাকে তিনি চেনেন, প্রতি ইঞ্চি জমি তাঁর মুখস্থ।

দেবব্রত সব জায়গায় নিয়ে গেলেও মরিস একটি পাহাড়কে এড়িয়ে যান। বান্দিপুরের বন একটি উঁচু মালভূমির ওপরে অবস্থিত। সেই পাহাড়টি মালভূমির ওপরে যেন উটের পিঠের কুঁজের মত বসানো আছে। ঐ পাহাড়ের তলায় দেবব্রতকে নিয়ে গেলেও পাহাড়ের ওপরে ওঠেন না মরিস। দেবব্রত মনে করে, বুঝি মরিসের হৃৎপিণ্ডঘটিত কোন ত্রুটি আছে, হয়তো এমন কোন হৃদরোগে ভুগছেন তিনি যার দরুন পাহাড়ে চড়তে তিনি পারেন না। এ ব্যাপারে অবশ্য মরিসকে কোন প্রশ্ন করে না সে। তার মনে হয়, এ ধরনের প্রশ্ন করে মরিসের মত দুর্ধর্ষ শিকারীকে শুধু বিব্রত করা হবে।

দেবব্রত মুখ ফুটে কিছু না বললেও তার মুখের ভাবে তার মনোভাব আন্দাজ করতে পারেন মরিস। মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে তিনি বলেন, আমি এই পাহাড়ে চড়ছি না কেন তা নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে তোমার? মুখ ফুটে যদিও কোন প্রশ্ন করছ না…

বুঝতে পারছি আপনার শারীরিক কোন অসুবিধে আছে।—মুখ নীচু করে দেবব্রত বললে, হয়তো কোন হার্ট ট্রাব্‌ল্—

—হার্ট ট্রাব্‌ল্ বা কোন শারীরিক অসুবিধে আমার নেই। বাধা না থাকলে দেখতে কী রকম দ্রুতগতিতে আমি পাহাড়ে চড়ছি।

—ঐ পাহাড়ে চড়তে কিসের বাধা মিস্টার মরিস?

—ঐ পাহাড়ের ওপরে বুনো বাইসনরা থাকে, তাই।

—বুনো বাইসন খুব হিংস্র জানোয়ার বুঝি?

—না। আত্মরক্ষার জন্য মাঝে মাঝে হিংস্র হয়ে উঠলেও মোটামুটি নিরীহ জানোয়ার। ওদের ওপরে কোন রকম উপদ্রব না করলে ওরা কিছু বলে না।

—তাহলে পাহাড়ে চড়তে বাধাটা কোথায়?

—পাহাড়ের নীচে ঐ যে গ্রামটা দেখছ, ওখানে 'কুরুবা' নামে উপজাতির মানুষরা বাস করে। পাহাড়ের ওপরে বসবাসকারী বুনো বাইসনদের ওরা আগলে

রেখেছে। ওরা চায় না যে, আমরা বাইসনদের কাছে যাই।

আপনাকেও ওদের কাছে ঘেষতে দিতে চায় না!—দেবব্রত অবাক হয়ে বললে, এ বনের বুনো জন্তু-জানোয়ারদের যে আপনি আগলে রেখেছেন তা কি ওরা জানে না?

জানে বই কি!—মরিস জবাব দিলেন, কিন্তু ওদের ধারণা, আর সব জানোয়ারদের বাঁচিয়ে রাখতে চাইলেও সুযোগ পেলেই আমি বাইসনদের মেরে ফেলব।

—ওদের এই ধারণার হেতু?

—ওদের এই ধারণার হেতু কী তা আমি এক কথায় বুঝিয়ে বলতে পারব না। তোমার যদি ধৈর্য থাকে, আগাগোড়া সব কিছু খুলে বলতে পারি।

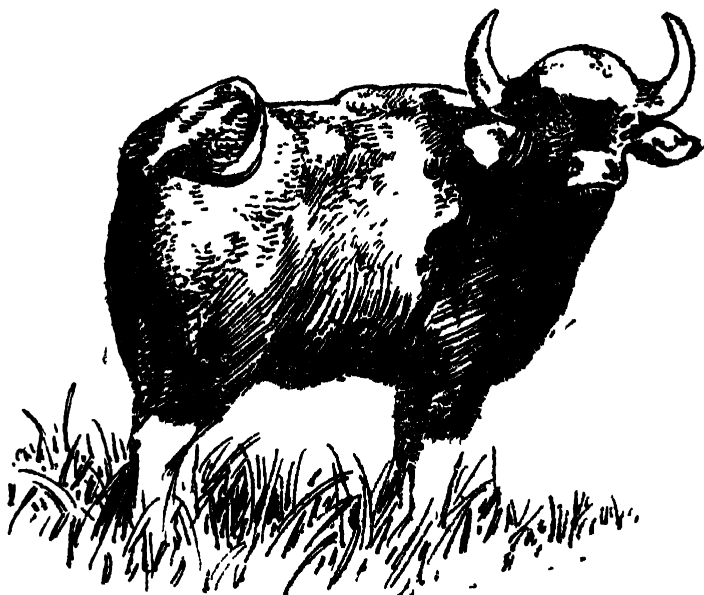
—বলুন না মিস্টার মরিস। আমার মত ধৈর্যবান শ্রোতা আপনি ভূভারতে কোথাও খুঁজে পাবেন না।

মরিস তাঁর কাহিনী শুরু করার আগে বুনো বাইসন সম্বন্ধে দু-একটি কথা বললেন। বাইসনকে ঠিক বন্য গরু বলা চলে না। বুনো গরু ও মহিষের মাঝা-মাঝি এক ধরনের জানোয়ার। দেখে কখনো গরু, কখনো বা মোষ বলে মনে হতে পারে। এদেশে যাকে আমরা বাইসন বলি, তাকে কিন্তু বাইসন বলা উচিত নয়। তা গরুরই বন্য সংস্করণ—মোষের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। 'বাইসন' না বলে তাকে 'গাওর' (Gaur) বলাই উচিত।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 'গাওর'-কে 'বাইসন' বলে ভুল করা হয় কেন? ব্যাপারটা নিয়ে দাক্ষিণাত্যে ও মধ্যভারতের বনে বনে সন্ধান নিয়েছিলেন বিখ্যাত বন্য প্রাণী সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ ই. পি. জি.। খোঁজখবর নিতে নিতে হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল যে, বনের মানুষরা 'গাওর'-কে 'ভ'ইসা' বলে থাকে, হয়তো তাকে তারা বুনো মোষ বলেই জানে। 'ভ'ইসা'-কে কোন কোন শিকারীর 'বাইসন' বলে ভুল হওয়া অসম্ভব নয়, হয়তো বনের মানুষদের মুখে 'ভ'ইসা' শুনে 'গাওর'-কে 'বাইসন' বলা হচ্ছে। মরিসও তাকে 'বাইসন'ই বলেন।

'বাইসন' বললেও তা যে 'গাওর' তা তাকে দেখেই বোঝা যায়। তবে তার গায়ের রঙ বুনো মোষের মতই ঘন কালো। কালো হলেও কালো রঙের মধ্যে একটা জৌলুস আছে যা মোষের গায়ের চামড়ায় দেখা যায় না। বলিষ্ঠ দেহ, উচ্চতায় পাঁচ থেকে ছয় ফুট, ওজন ন'শো কেজিরও বেশি, মাঝে মাঝে এক টন ওজনের বড়ো আকারের বাইসনও দেখা যায়। তার বিপুল মাংসবহুল শরীরের অনুপাতে পা চারটিকে রীতিমত খাটো বলে মনে হয়। কাঁধ বেশ চওড়া, গলার নীচে সুন্দর গল-কম্বল। তার চলার সঙ্গে তাল রেখে গল-কম্বল দুলতে থাকে। মাথায় খাটো, বাঁকানো ঈষৎ সবুজ রঙের শিঙ। মাথার চাঁদির ওপরটা কিছুটা উঁচু,

দু'দিকে নীচু হয়ে শিংয়ের গোড়ায় গিয়ে মিশেছে। কপালটি ফ্যাকাশে সাদা, পায়ের নীচের দিক ফ্যাকাশে বাদামী রঙের, যেন মোজা পরেছে।



বাইসন পাহাড়ের ওপরে থাকতে ভালবাসে। গভীর বনে ঢাকা পাহাড়ের ওপরে তারা বাস করে। বান্দিপুরের পর্বতচূড়ার কাছে চার হাজার ফুটেরও ওপরে তাদের বাস। স্ত্রী বাইসনরা সন্তানবৎসল, স্বভাবে হিংস্র নয়। তবে সন্তানদের নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটলে তারা তেড়ে আসে। হিংস্রতা পুরুষ বাইসনদেরও স্বাভাবগত নয়, কিন্তু দলের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে তারা প্রায়ই আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেয়। কাজেই পুরুষ বাইসনদের সম্বন্ধে খুব সতর্ক হওয়া দরকার। একদা জলপাইগুড়ির একটি বনে একটি ক্ষেপে যাওয়া বাইসন একজন বনরক্ষককে শিঙ দিয়ে গুঁতিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল এবং শিঙ দিয়ে তার দেহটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে তাকে মেরে ফেলেছিল।

বুনো হাতি ও মোষেদের মত বাইসনরা জলার ধারে ঘাসবনের মধ্যে চরে বেড়ায়। ঘাস খেয়ে পেট ভরিয়ে জলার জলে তেষ্টা মেটায়। তারপর বনের গভীর অংশে ঢুকে ছায়াঘেরা ঠাণ্ডা জায়গায় বিশ্রাম করে। বনের মধ্যে যেখানকার মাটি লবণাক্ত, সেখানে থাকতেই এরা ভালবাসে। মাঝে মাঝে নোনা মাটি চাটে। নুনমেশানো মাটি খেলে নাকি এদের পেটের কৃমি মরে যায়।

বুনো হাতি বা মোষদের মত বাইসনরাও দল বেঁধে থাকে। তবে একই দলের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ বাইসনরা দু'টি পৃথক্ উপদলে বিভক্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। বছরের

মধ্যে বিশেষ একটা সময়ে (সাধারণত শীতকালে) তারা একত্র হয়। তখন পুরুষ বাইসনদের মধ্যে দলের নেতৃত্বের জন্য লড়াই বেধে যায়। যে জেতে সে চায় যে, হেরে-যাওয়া বাইসনরা তার বশ্যতা স্বীকার করে নিক। যারা তার বশ মানে না, তারা দল ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। বলা বাহুল্য, স্ত্রী বাইসনরা এই লড়াইয়ে কোন অংশ নেয় না, জিতে-যাওয়া পুরুষ বাইসনের নেতৃত্ব তারা নিঃশব্দে মেনে নেয়।

পুরুষ বাইসনের এই একনায়কত্বের নেশা কেটে যায় মাস দুয়েকের মধ্যে। তারপর সে দলছুট বাইসনদের খোঁজ নেয় এবং তাদের ডেকে নিয়ে আবার ছত্রভঙ্গ পুরুষ-বাইসনদের সেই উপদলকে গড়ে তোলে নতুন করে।

বাইসনদের স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য মরিস চেয়েছিলেন বাইসনদের কাছাকাছি থাকতে। তাই বান্দিপুরে গিয়েই বন বিভাগের অধিকর্তাকে অনুরোধ করেছিলেন বাইসনদের আস্তানাটি তাঁকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য।

মরিসের অনুরোধ শুনে কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করেন বন বিভাগের অধিকর্তা। একটু ইতস্তত করে তিনি মরিসকে বললেন, বাইসনরা যে কোথায় আছে তা আমি ঠিক জানি না মিস্টার মরিস।

বলেন কী !—মরিসের চোখ দু'টি কপালে উঠবার উপক্রম হল ঃ আপনাদের সংরক্ষিত বনের এলাকার মধ্যে বাইসনরা বাস করে, অথচ আপনারাই জানেন না ওরা কোথায় থাকে !

—না মিস্টার মরিস। সংরক্ষিত বনের এলাকার মধ্যে থাকলেও ওদের গোপন আস্তানার খবর কুরুবারাই রাখে। ওদের দেখতে হলে কুরুবাদের সর্দারের শরণাপন্ন হতে হবে। সে হুকুম দিলে তবেই কুরুবাদের মধ্যে একজন আপনাকে পাহাড়ের ওপর বাইসনদের আস্তানায় নিয়ে যাবে।

—বাইসনদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনারা বুঝি কুরুবাদের দিয়েছেন ?

—না, ওরা নিজেরাই বাইসনদের আগলে রেখেছে, কারণ শিকারীরা আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে বাইসন মেরে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল। ওরা যখন বুঝল যে বাইসনদের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা বন বিভাগের নেই, তখন ওরা বাইসনদের তাড়া করে বনের মধ্যে খুব দুর্গম একটি গোপন জায়গায় নিয়ে গিয়ে রেখেছে। ওখানে একটি ছোটখাটো হ্রদ আছে, ঘাসে-ছাওয়া মাঠেরও অভাব নেই। কাজেই বাইসনরা ওখানে বসবাস করতে আপত্তি করে নি।

—বাইসনদের মত আর সব জানোয়ারদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যও নিশ্চয়ই ওরা খুব তৎপর ?

—না, ঠিক তা নয়। আর সব জানোয়ারদের নিয়ে ওরা তেমন মাথা ঘামায় না।

কেন বলুন তো ?—মরিস অবাক হয়ে তাকালেন বন বিভাগের অধিকর্তার মুখের দিকে।

—কারণ বাইসনকে ওরা দেবতা জ্ঞানে পূজা করে থাকে। বনবিভাগের অধিকর্তা জবাব দিলেন—কুরুবাদের গ্রামে গেলে ওদের দেবতার স্থানে বাইসনদের মূর্তি দেখতে পাব।

—বাইসনদের মূর্তি নয়, বাইসন দেখতে চাই আমি। আপনি কুরুবাদের সর্দারকে ডেকে বলে দিন না।

—সর্দার আমার কথা শুনবে না। অপনি ওদের গ্রামে গিয়ে সর্দারের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রমাণ দিন যে, আপনি শুধু দেখার জন্য বাইসন দেখতে চান, শিকারের কোন মতলব নেই আপনার। তখন সে আপনাকে বাইসনদের এলাকায় নিয়ে যাবার জন্য গাইড ঠিক করে দেবে।

মরিস তৎক্ষণাৎ গেলেন কুরুবাদের গ্রামে। সেখানে পৌঁছে সর্দারের খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলেন যে, সে তার বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে না, কারণ তার ছেলে খুবই অসুস্থ।

সঙ্গে সঙ্গে সর্দারের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন মরিস এবং নিজেকে চিকিৎসক বলে পরিচয় দিলেন। পেশায় চিকিৎসক না হলেও চিকিৎসা বিজ্ঞানে মরিসের কিঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল। সর্দারের ছেলেকে পরীক্ষা করেই তিনি বুঝলেন যে, সে টাইফয়েডে ভুগছে। তাঁর ওষুধের বাক্সে অন্যান্য ওষুধপত্রের সঙ্গে টাইফয়েডের ওষুধ, ভিটামিনের বড়ি ইত্যাদি ছিল। সেই ওষুধ ও ভিটামিন ছেলেটির পেটে পড়তে তার জ্বর নামতে থাকে। দিন দুয়েকের মধ্যেই ছেলেটির জ্বর সম্পূর্ণ ছেড়ে যায় এবং কুরুবারা মরিসকে সাক্ষাৎ রোগহর দেবতা বলে মনে করে। ফলমূল ও মুর্গী উপহার দিয়েই তাদের তৃপ্তি হয় না, তারা তাঁকে আরো কিছু দিতে চায়।

আমাদের কাছ থেকে আরো কিছু নিন আপনি।—সর্দার কৃতজ্ঞতায় গাঢ়স্বরে বললে, বলুন আর কী পেলে আপনি খুশী হবেন।

মরিস বললেন, আর কিছুই চাই নে আমি, শুধু বাইসনরা যে বনে আছে, সেখানে যেতে চাই।

নিমেষে কঠোর হয়ে উঠল সর্দারের মুখ। গম্ভীর গলায় সে বললে, বাইসন শিকারের মতলব আছে বুঝি আপনার ?

—না, শিকারের মতলব নিয়ে আমি বান্দিপুরে আসিনি। আমি এসেছি ছবি তুলতে। বাইসনদের ছবি তুলতে চাই আমি।

কয়েক মুহূর্ত সন্দিগ্ধ মরিসের মুখের পানে তাকিয়ে থেকে সর্দার বললে, ছবি তোলার নাম করে শিকার করবেন না তো ?

মরিস মৃদুহেসে বললেন, না, তেমন কোন কুমতলব আমার নেই। আমার সঙ্গে ডাকবাংলোতে যদি আস, তোমাকে দেখিয়ে দিতে পারি যে আমার কাছে ক্যামেরা ও তার সাজসরঞ্জাম ছাড়া আর কিছু নেই।

—ঠিক আছে। চলুন, আমি নিজের চোখে যাচাই করে দেখব।

দেখল সর্দার। কিন্তু তবু তার সন্দেহ ঘুচল না। কারণ ক্যামেরা ও তার আনুসঙ্গিক সাজসরঞ্জামগুলো যে আগ্নেয়াস্ত্র নয় মরিস তাকে তা বোঝাবার চেষ্টা করলেও সে তা বুঝতে পারে না। ক্যামেরার টেলি-লেন্‌স্ ও তেপায়াকে সে বিশেষ ধরনের মেশিনগান ও রাইফেল বলে মনে করে। মরিস শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে উঠে তেপায়ার ওপরে তাঁর সিনে-ক্যামেরা বসিয়ে সর্দারের ছবি তুলতে উদ্যত হন। তাতে বিষম ভয় পেয়ে সর্দার বললে, ওটা চালাবেন না স্যার—আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি!

মরিস বললেন, সোজা বাইসনদের বনে নিয়ে চল।

দুর্গম চড়াই বেয়ে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল। রাতের অন্ধকারে ঘোরাঘুরি করে অন্য জানোয়ারদের মুখোমুখি হলেও বাইসনের দেখা মিলবে না, কাজেই রাতের মত সর্দারকে নিয়ে একটি কাশের খুপরির মধ্যে আশ্রয় নিলেন মরিস।

পরদিন সকালে সর্দার মরিসকে নিয়ে বনের সবচেয়ে গভীর ও দুর্গম অংশে প্রবেশ করল। এখানে বড় বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে আছে ছোট ছোট লতাগাছের ঝোপ ও ঘাসবন। হরিণের পায়ে-চলা পথও নেই, কাজেই টাঙ্গি নিয়ে ডালপালা কেটে পথ করে এগিয়ে যেতে হয়।

এমনি পথের চিহ্নহীন গভীর বনের মধ্যে বাইসনদের আস্তানাটি সর্দার কী করে খুঁজে পাবে ভেবে পান না মরিস। তাকে প্রশ্ন করেও তিনি কোন জবাব পান না।

চলতে চলতে জায়গায় জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে সর্দার লতাপাতা ও ঘাসের চাপড়া পরীক্ষা করে। পাথুরে জমির মধ্যে পায়ের ছাপ ফুটে ওঠা সম্ভব নয়, কাজেই ঘাসের মধ্য দিয়ে মাটিতে কিসের চিহ্ন সে খুঁজছে তা বুঝতে পারেন না মরিস। মাঝে মাঝে সে লতাঝোপের পাতায় জমে থাকা শিশিরবিন্দুগুলিকে পরীক্ষা করে। লতাগাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায় জড়িয়ে থাকা মাকড়সার জালগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। এইসবের মধ্যে বাইসনদের গতিবিধির হদিস কী করে প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে ভেবে পান না মরিস। কিন্তু প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই, কারণ সর্দার কোন কথাই বলছে না।

চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল সর্দার এবং মুখ তুলে বাতাসে গন্ধ শুঁকতে লাগল। কিসের গন্ধ সে শুঁকছে কে জানে, কারণ বাতাসে বুনো লতাপাতা ও ফুলের গন্ধের মধ্যে কোন ব্যতিক্রমই পাচ্ছেন না মরিস। সহসা হাত

তুলে মরিসকে ওখানেই অপেক্ষা করতে ইঙ্গিত করল সর্দার।

একটানা প্রায় এক ঘণ্টা ধরে প্রতীক্ষার পর হঠাৎ সামনের ঘাসবনের মধ্যে স্পন্দন জাগে। তারপর প্রায় এক হাজার ফুট দূরে ঘনসন্নিবিষ্ট সেগুন গাছগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে বারো-চোদ্দটা বাইসন। চরতে চরতে ঘাস খেতে খেতে ধীরেসুস্থে এগিয়ে আসে তারা। মরিস বা সর্দারকে বোধ হয় তারা দেখতে পায় নি, কিংবা দেখেও দেখে না।

খানিকক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে এদের দিকে চেয়ে থাকেন মরিস। সকালের রোদে ঝলমল করে এদের গায়ের চকচকে কালো চামড়া।

খাপ থেকে ক্যামেরা বের করেন মরিস। স্টিল ক্যামেরা ও সিনে ক্যামেরা। দু'টো ক্যামেরাতেই টেলিলেন্‌স্ বসিয়ে নেন। তারপর উদ্যত হন ছবি তুলতে।

এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে মরিসের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল সর্দার। চোখের ওপরে ক্যামেরাটা মরিস তুলে ধরতেই সে বিকট চিৎকার করে ওঠে।

চিৎকার করছ কেন? চাপা ধমক দিয়ে উঠলেন মরিস—তোমার চিৎকার শুনে বাইসনগুলো যে তেড়ে আসবে।

—তাই তো চাই আমি,—চাপা গম্ভীর গলায় বললে সর্দার—আপনি ওদের মারবেন, আর ওরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে না, সে কী হয়?

—But I am shooting with my camera, not with gun— ইংরাজীতে বলে উঠলেন মরিস।

বলা বাহুল্য, মরিসের কথার মর্ম বুঝতে পারে না সর্দার এবং সে চীৎকার করে যেতে থাকে।

সর্দারের চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে বাইসনদের দল থেকে একজন বেরিয়ে আসে। তারপর মাটিতে তার সম্মুখের দু'পায়ের খুর ঘষতে থাকে।

বিপুল আকারের বাইসনটি আয়তনে সাধারণ ষাঁড়ের চেয়ে অনেক বড়। তার দাঁড়াবার দৃপ্ত ভঙ্গী, উজ্জ্বল জ্বলন্ত দু'টি চোখ রীতিমত মোহিত করে মরিসকে। বাইসনটি যে তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে তা যেন তিনি ভুলেই যান। ক্যামেরা তুলে তিনি ছবি তুলে যান। প্রথমে স্টিল ক্যামেরা দিয়ে স্থির চিত্র, তারপর সিনে ক্যামেরা দিয়ে ক্ষিপ্ত ষাঁড়টির তেড়ে আসার চলচ্চিত্র—ক্ষিপ্ত গতিতে ক্যামেরা চালিয়ে যান মরিস···

সর্দার এবারে বুঝতে পারে যে, ক্যামেরা ছবি তোলার যন্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র নয়। কিন্তু বাইসনটি তখন ক্ষেপে গিয়ে শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসছে মরিসকে লক্ষ্য করে, আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁকে সে তার শিঙের ঘায়ে মাটিতে ধরাশায়ী করবে।

ছেলের প্রাণদাতাকে এমনি বেঘোরে মরতে দিতে পারে না সর্দার। সে নিজে বাইসনটিকে ক্ষেপিয়েছে, অতএব তারই কর্তব্য তাকে সামলানো। কিন্তু সে

নিরস্ত্র, ক্ষিপ্ত বাইসনকে নিরস্ত করা যে বিনা অস্ত্রে সম্ভব নয় তা সে বোঝে। কী করবে ভেবে না পেয়ে সে অস্থির হয়ে ওঠে।

মরিস তখন নিজের জীবনের পরোয়া না করে ক্যামেরা চালিয়ে যাচ্ছেন, আসন্ন বিপর্যয়ের সঙ্কট তাঁকে এতটুকু শঙ্কিত করছে না। সর্দার চিৎকার করে পালিয়ে যেতে বলে তাঁকে, কিন্তু তার কথায় তিনি কর্ণপাতও করেন না।

সর্দার বুঝতে পারে যে, মরিস নিজেকে বাঁচাবার কোন চেষ্টাই করবেন না। অতএব তাকেই চেষ্টা করতে হবে তাঁকে বাঁচাতে।

বাইসনটা তখন খুব কাছে এসে গিয়েছে। আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড।

বিনা অস্ত্রে ক্ষিপ্ত বাইসনের সঙ্গে লড়াই করা যায় না, অতএব মরিসকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় নিজের প্রাণ দেওয়া। তাই দিতে যায় সর্দার—চোখের নিমেষে সে মরিসকে আড়াল করে দাঁড়ায় বাইসনের মুখোমুখি।

ও কী করছ সর্দার!—আর্তস্বরে বলে ওঠেন মরিস এবং ক্যামেরা ছেড়ে দিয়ে পকেট থেকে ক্ষিপ্র গতিতে তাঁর পিস্তল বের করে আনেন। পরমুহূর্তে পরপর দু'টি গুলি করেন মরিস বাইসনের শিঙ দু'টোর মাঝখানে।

পাকা শিকারী মরিস, অব্যর্থ তাঁর লক্ষ—নিমেষে ধরাশায়ী হলো বাইসনটি। মরিসের পিস্তলের গুলি তার মস্তিষ্ক ভেদ করেছে, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সে প্রাণ হারাল।

নিষ্প্রাণ বাইসনের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে সর্দার গম্ভীর গলায় বললে, এ কী করলেন আপনি স্যার!

মরিস বললেন, তোমাকে বাঁচাবার জন্যই মারতে হল ওকে, নইলে কি আর—

আপনার নিজের জান বাঁচাবার জন্য কি ওকে মারতেন না স্যার?—সর্দার মরিসের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললে।

কাষ্ঠহাসি হেসে মরিস বললেন, না মারলে কি আর পারতাম নিজেকে বাঁচাতে! বাধ্য হয়েই মারতে হত। কিন্তু ভেবে দেখ সর্দার, তুমি ওকে ক্ষেপিয়ে তুললে বলেই ওকে মারার দরকার হল। নইলে ও বেঁচে থাকত। বাইসনদের ছবি তোলা ছাড়া অন্য কোন মতলব নিয়ে তো আসি নি আমি এখানে।

সর্দার গম্ভীর মুখে বললে, নিজেকে বাঁচাবার জন্য আপনি যাই করুন না কেন, আমাকে বাঁচাবার জন্য ওকে মারা উচিত হয় নি আপনার।

—কিন্তু ও যে তোমাকে মেরে ফেলত!

—তা না হয় ফেলত, কিন্তু তাতে তেমন কিছু ক্ষতি হত না। আমার চেয়ে ওর প্রাণের দাম বেশী।

এর পর আর কোন কথা বলেন নি মরিস। সর্দারের মুখেও আর কোন কথা

জোগায় না—তার মুখের ভাবে অবশ্য বোঝা যায় যে, সে বেশ মর্মাহত।

মরিস তাঁর কাহিনী শেষ করে বললেন, বুঝতে পারছ তো মিস্টার ঘোষ, আমি যে বাইসনদের বাঁচিয়ে রাখতে চাই তার প্রমাণ দিতে গিয়েও পারি নি দিতে, কারণ ক্যামেরা দিয়ে শুটিং করতে গিয়ে পিস্তল দিয়ে শুট করতে বাধ্য হয়েছিলাম। কাজেই বাইসনদের বনের ঠিকানা জানলেও ওখানে যাবার বা কাউকে নিয়ে যাবার উপায় নেই আমার।

॥ চোদ্দ ॥

শিমলিপালের জঙ্গলের মধ্যে কাজ করতে করতে সুকিন্দার জঙ্গলে কাজ করার নির্দেশ পাই। কটক জেলার অন্তর্গত সুকিন্দার মাটিতেও নিকেলের লক্ষণ দেখা গিয়েছে।

শিমলিপালের মত সুকিন্দার বন তেমন গভীর না হলেও বন্য প্রাণিদের বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। ফরেস্ট গার্ড পাণ্ডুরং জেনা আমাকে বললে, এ জঙ্গলে সব রকম বুনো জন্তুই আছে হুজুর। বাঘ চিতাবাঘ হাতি সম্বর চিতল ভালুক এমন কি বুনো বাইসনও ঘুরে বেড়ায় এই বনের মধ্যে। মনে রাখবেন, সর্বদাই ওরা ওৎ পেতে আছে…

আমি বললাম, সম্বর চিতল এরাও ওৎ পেতে আছে নাকি ?

—আছে বই কি হুজুর! নিজেদের জান বাঁচাবার জন্য ওরাও তেড়ে আসে। সেদিন একটা নেকড়ে বাঘকে শিং দিয়ে জখম করেছিল একটি বারশিঙ্গা…

—দেখ পাণ্ডুরং, নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য তেড়ে যে কেউ আসতে পারে, কিন্তু শিকারের জন্য ওৎ পেতে থাকে একমাত্র মাংসাশী জন্তুরা। তুমি যাদের নাম করলে তাদের মধ্যে বাঘ বা চিতাবাঘ ছাড়া আর তো কেউ মাংসাশী নয়…

—মাংসাশী না হলেও ওরা সাংঘাতিক হিংস্র হুজুর। হাতি, বাইসন ও ভালুক বাঘের চেয়েও হিংস্র,—মানুষ দেখলেই আক্রমণ করে।

মৃদু হেসে আমি বললাম, কই আমাকে দেখে ত কেউ আক্রমণ করে না। বহুদিন ধ'রে সুকিন্দার এই জঙ্গলের মধ্যে কাজ করছি…আমার কাজের সূত্রে পুরো জঙ্গলটাকে চষে ফেলেছি—কিন্তু হাতি, বাঘ বা শূয়োর কেউই তো আমার ওপরে হামলা করেনি।

পাণ্ডুরং বললে, ওদের মুখোমুখী হননি বলেই হামলা করেনি ওরা।

– মুখোমুখী না হলেও কাছাকাছি ঘুরে বেড়াতে দেখেছি বুনো হাতি ও শূয়োরকে। কিন্তু আমাকে দেখেও দেখেনি ওরা—আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও করেনি।

আপনি বোধহয় ভালুকের পাল্লায় পড়েননি কখনো। —পাণ্ডুরং হাসতে থাকে মৃদুমন্দ।—দেখেও না দেখা ভালুকের স্বভাব নয়…দেখা মাত্র তেড়ে আসে। সেদিন কাঠপালের একজন কাঠুরে বীরশালের শালবনের মধ্যে কাঠ কাটছিল।

একটা ভালুক তার পেছন দিক থেকে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে পিষে ফেলেছিল।

লোকটা মরে যায়নি তো!—আমি আঁতকে উঠলাম।

—পিষে ফেলার পর কী আর কেউ বেঁচে থাকতে পারে!

—তুমি তাহলে বলতে চাও যে ভালুক সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকা উচিত?

—সতর্ক সব জানোয়ার সম্বন্ধেই হওয়া উচিত—তবে ভালুককে পুরোপুরি এড়িয়ে চলতে হবে।

আমি বললাম, এড়িয়ে চলতে হলে তো জানা দরকার কোথায় থাকে ওরা। ঘন বনের মধ্যে হাতি কোথায় থাকে তাই বুঝতে পারি নে—ভালুকের বাসা কী আর পারব চিনে নিতে!

আমি পারব হুজুর।—পাণ্ডুরং বললে। —হাতির আস্তানা, বাঘের গুহা, ভালুকের ডেরা সব আমি চিনি।

—কোথায় থাকে ভালুকরা?

—সাধারণত গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে থাকে…মাঝে মাঝে গুহার ভেতরেও আশ্রয় নেয়। যেখানেই থাকুক না কেন ওদের গায়ের গন্ধ থেকেই চিনতে পারব ওদের বাসা।

—অন্য জানোয়ারের গায়ের গন্ধ থেকে ভালুকের গায়ের গন্ধ তফাত করতে পারবে?

—নিশ্চয়ই পারব।

—তাহলে তোমাকেই আমার বনে-জঙ্গলে ভ্রমণের সঙ্গী করে নিতে হয়…

—রেঞ্জার সাহেবকে বলুন না স্যার, তিনি অনুমতি দিলেই আমি আপনার গাইড হিসাবে কাজ করব।

ফরেস্ট রেঞ্জার অনুমতি দিলেন। তারপর আমার সঙ্গে ঘোরাঘুরি শুরু করল পাণ্ডুরং জেনা।

আমার কাজ ছিল উড়িষ্যার অন্তর্গত সুকিন্দার বনাঞ্চলে নিকেলযুক্ত খনিজের সন্ধান। এই অনুসন্ধানের সূত্রে বনের একটা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পরিক্রমা করছিলাম আমি। খুব ঘন বন। শাল, পিয়াশাল, কোংরা, আসান, জাম, অর্জুন প্রভৃতি বড়ো বড়ো গাছের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে ঘন লতাঝোপ। লতাঝোপের মধ্য দিয়ে হাঁটা মুশকিল—পথ তৈরি করে পথ চলতে হয়।

সেদিন সরুয়াবিল থেকে কামারদার দিকে যাচ্ছিলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে অন্ধকার জমতে শুরু করেছে।

ঘন আতশুীলতার ঝোপের মধ্য দিয়ে আগে থেকেই পথ তৈরি করা ছিল।

সেই পথ ধরে চলছিলাম আমরা।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ায় পাণ্ডুরং। আতঙ্কে পাণ্ডুরং হয়ে উঠেছে তার মুখ।

তার সঙ্গে আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম। তার মুখের পানে তাকিয়ে চাপা গলায় বললাম, কী ব্যাপার পাণ্ডুরং ?

ব্যাপার সাংঘাতিক হুজুর।—ফিস্‌ফিসিয়ে জবাব দিলে পাণ্ডুরং।—ভালুকের গায়ের গন্ধ পাচ্ছি···কাছেই আছে···

—কাছেই আছে! কই সাড়াশব্দ তো কিছু পাচ্ছি নে!

—সাড়াশব্দ পাবেন না হুজুর···এক রকম নিঃশব্দেই—

পাশের লতাঝোপটা কেঁপে উঠতেই পাণ্ডুরং-এর মুখের কথা মুখেই থেকে যায়।

লতাঝোপ ভেদ করে বেরিয়ে আসে কালো একটি ভালুক। আকারে মস্ত বড়।

লতাঝোপের মধ্য থেকে বেরিয়ে আমাদের সামনে থমকে দাঁড়ায় ভালুকটা।

পালান হুজুর।—অস্ফুট আর্তস্বরে বলে উঠল পাণ্ডুরং।

কিন্তু আমরা পালাবার আগেই পালিয়ে গেল ভালুকটা।

ভালুকটাকে পালাতে দেখে আমার চেয়ে বেশি অবাক হল পাণ্ডুরং।

আমাদের দেখামাত্র পালাল—আশ্চর্য্য ব্যাপার তো!—ভালুকটার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে পাণ্ডুরং।

আমি বললাম, আমাদের দেখে ভয় পেয়েছে বলেই পালিয়েছে···

—ভালুক তো মানুষকে ভয় পায় না···মানুষ দেখলেই তেড়ে আসে···

—আমাদের দেখামাত্র যখন পালিয়েছে, তখন ধরে নিতেই হয় যে আমাদের দেখে ভয় পেয়েছে।

—ভয়! সে হয়তো আমাদের দেখতে পায়নি হুজুর···হয়তো অন্য কোন কারণ আছে।

—অন্য কী কারণ থাকতে পারে বল! এখানে তো আমরা ছাড়া আর কেউ নেই···

—আর কেউ হয়তো তাড়া করেছে ওকে···ধরুন বুনো হাতি বা বাইসন···

আবার কেঁপে উঠল পাশের লতাঝোপটা।

ভালুকটাকে যে তাড়া করেছে সে এসে গিয়েছে হুজুর!—পাণ্ডুরং ফিস্‌ফিসিয়ে বলে উঠল।—এবার পালান···

কিন্তু আমরা পালাবার আগেই আর একটা ভালুক বেরিয়ে এল লতাঝোপের আড়াল থেকে—প্রথম ভালুকটার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেও বনের মধ্যে অদৃশ্য হল চোখের নিমেষে।

এই ভালুকটাই ঐ ভালুকটাকে তাড়া করেছে!—আমি অবাক হয়ে বললাম : ভালুকের তাড়া খেয়ে ভালুক পালাল!

পাণ্ডুরং মুচকি হেসে বললে, এটা মাদী ভালুক হুজুর—ঐ পুরুষ ভালুকটাকে পাকড়াও করতে চায়…

—পাকড়াও করে মেরে ফেলবে বুঝি!

—না হুজুর, পাকড়াও করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

—তুমি জানলে কী করে যে পুরুষ ভালুকটা ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে!

—পুরুষের স্বভাবই যে এই হুজুর। পাণ্ডুরং হাসতে হাসতে বললে।

॥ পনের ॥

এপর্যন্ত যাদের কথা বলেছি, তাদের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র হচ্ছে দেহের শক্তি ও আক্রমণের বদলে প্রতি-আক্রমণ। অনেক সময় আক্রমণ আশঙ্কা করে তারা সরাসরি আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেয়, যার জন্য তাদের হিংস্র জানোয়ার বলে চিহ্নিত করা হয়।

তাদের স্বভাবে হিংস্রতা থাকলেও অকারণ হিংস্রতা যে তাদের মধ্যে নেই তা আশা করি পাঠক পাঠিকারা আমার কাহিনীগুলো পড়ে বুঝতে পারবেন। আত্ম-রক্ষার তাগিদে হিংস্রতাকে হিংস্র বলা চলে না।

এখন আসুন আমরা এমন কয়েকটি বন্য পশুর কাছে নিয়ে যাই আপনাদের, যারা নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য শুধু পালিয়ে বেড়ায় এবং মানুষ ও হিংস্র প্রাণীদের দৃষ্টি এড়ায়। তাদের মধ্যে আছে নানা রকম হরিণ, বুনো গাধা, ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতি।

তখন চৈত্রমাস। জীপে করে অমরকণ্টক যাচ্ছিলাম আমি ও আমার বন্ধু গোপীন। মহাকাল (মেকল) পর্বতের পূর্বপ্রান্তে অমরকণ্টক—সমুদ্রের সমতল থেকে মাপলে প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু। পেনড্রা, অনুপপুর ও শাডোলের সমতলভূমি থেকে দেখলে মনে হয় যেন মাটি নিজের সীমা অতিক্রম করে উধাও হয়েছে আকাশপানে। মনে হয় পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে আকাশকে যেন ছুঁতে পারব।

পাহাড়ের ঠিক নীচে পৌঁছে গাড়ি থামাল গোপীন। বনের ঘনত্বের দরুন উপরের দিকটা নীলাভ হয়ে উঠেছে—নীচে ঘন সবুজ। শাল, কেঁদ ও তেন্দুগাছের বন পাথুরে মাটিকে চাপা দিয়ে রেখেছে। গাছের ফাঁকে লতাঝোপ ও ঘাসবন, মাঝে মাঝে এক ধরনের অর্কিডও চোখে পড়ে।

গাড়ির পেছনে বসে ছিল আমাদের গাইড দৌলত—তার দিকে তাকিয়ে গোপীন বললে, এখান থেকেই তো ওপরের দিকে উঠতে হবে আমদের, কী বল দৌলত ?

দৌলত জবাব দিল, হ্যাঁ হুজুর—সড়কের ধারে ফরেস্ট বাংলো থেকে শুরু হয়েছে পথটা।

আমি বললাম, পায়ে হেঁটে যেতে হবে নাকি ?

মৃদু হেসে দৌলত বললে, হরিণ ও বুনো শুয়োরের পায়ে পায়ে তৈরি শুঁড়ি পথ—পায়ে হেঁটে যেতে হবে বইকি।

ওপরে কী না উঠলেই নয় গোপীনদা!—কাতর চোখে তাকালাম আমি গোপীনের দিকে।

না উঠলে বকসাইট দেখবে কী করে!—গোপীন গম্ভীর মুখে বলল।

দৌলত বললে, গাড়ি থেকে নামুন স্যার—ঐ ফরেস্ট বাংলোর দিকে যেতে হবে আমাদের···পথটা ওখান থেকেই শুরু হয়েছে।

গোপীন বললে, পথ তুমি চেন তো দৌলত?

দৌলত জবাব দিল, না হুজুর চিনিনে···চেনে ঐ ফরেস্ট বাংলোর চৌকিদার বিষেণরাম···

গোপীন বললে, এই জঙ্গলে পথ চলার কথা ভাবতেই আমাদের হৃৎকম্প হচ্ছে—অথচ মিহির রায়চোধুরী এই জঙ্গলের মধ্যেই বকসাইট আবিষ্কার করেছিলেন!

আমি বললাম, সত্যিই ভারি আশ্চর্য ব্যাপার!

রাস্তার পাশেই বন বিভাগের বিশ্রামগৃহ। আমরা বাংলোর কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকতেই চৌকিদারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে একজন চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবতী। ভুরু কুঁচকে আমাদের দিকে তাকিয়ে ঝাঁজালো স্বরে বললো, কী চাই তোমাদের?

দৌলত বললে, বিষেণরামকে চাই—তাকে একটু ডেকে দাও না।

তার সঙ্গে তোমাদের কী দরকার শুনি!—মেয়েটি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাল।

কে রে রাধা?—বলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে একজন বলিষ্ঠ গড়নের যুবক। তার পরনে মোটা কাপড় ও মাথায় পাগড়ি।

এই যে বিষেণরাম!—যুবকটিকে দেখামাত্র আকর্ণবিস্তৃত হাসি ফুটে উঠল দৌলতের মুখে।—চল দিকিনি বারশিঙ্গার আস্তানায়···ঐ যে যেখানে রায়চৌধুরী সাহেব মাল পেয়েছিলেন···আমার সাহেবরা সেই মাল দেখবেন।

মাল দেখবেন না শিকার খেলবেন!—রাধা ক্রুদ্ধ স্বরে বললে।

দৌলত বললে, না না, শিকার খেলতে আসেননি আমার সাহেবরা।

শিকার খেলতে আসেননি তো সঙ্গে বন্দুক এনেছেন কেন শুনি!—বলে গোপীনের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল রাধা।

—নিজেদের জান বাঁচাবার জন্যে নিয়ে এসেছেন—শিকার খেলার জন্য নয়। ধরো বাঘ, চিতাবাঘ, বা ভাল্লুক যদি আমাদের আক্রমণ করে খালি হাতে তো ওদের সঙ্গে লড়াই করা যাবে না!···

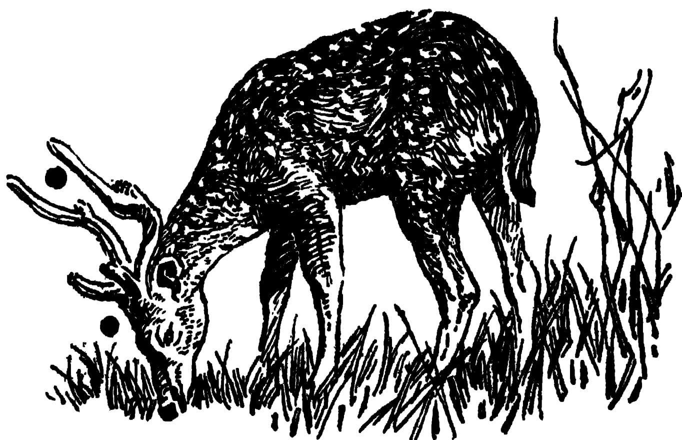
গোপীনের মুখের দিকে তাকিয়ে রাধা বললে, বাবুজী, এখানকার জঙ্গলে শয়ে শয়ে চিতল কোৎরা, সম্বর ও বারশিঙ্গা ঘুরে বেড়ায়···খবরদার ওদের একটিকেও মারবার চেষ্টা করবে না কিন্তু।

একটিও না!—গোপীন ক্ষীণ স্বরে বললে, ধরো একটা চিতা বা বারশিঙ্গা···

না কিছুই না।—রাধা দৃঢ় স্বরে বললে।

চিতল, কোৎরা, সম্বর, বারশিঙ্গা—এসব কী গোপীনদা?—আমি প্রশ্ন করলাম।

নানা জাতের হরিণ।—গোপীন জবাব দিল।—চিতল হচ্ছে স্পটেড ডিয়ার, কোৎরা বার্কিং ডিয়ার। সম্বর প্রায় গরুর মত বড় আকারের হরিণ। বারশিঙ্গা সম্বরের চেয়ে একটু ছোট, কিন্তু তার শিং দু'টি খুবই বড়। প্রত্যেকটি শিঙে ছ'টা করে শাখা আছে—দেখে মনে হয় যেন বারটা শিং আছে তার মাথায়…এইজন্য তার নাম দেওয়া হয়েছে বারশিঙ্গা।



দৌলত বললে, বারশিঙ্গার আস্তানার দিকেই যাব আমরা—ওখানেই আছে রায়চৌধুরী সাহেবের বকসাইট। চল হে বিষেণরাম, আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

বিষেণরাম হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, বন্দুকটা আমাকে দাও বাবুজী… তোমাদের বন্দুক আমি বয়ে নিয়ে যাব…

গোপীন বললে, কিন্তু…

—কিন্তু কিন্তু করলে চলবে না বাবুজী—বারশিঙ্গার আস্তানায় যেতে চাও তো বন্দুকটা আমাকে দিতে হবে!

অগত্যা বন্দুকটা বিষেণরামকে দিয়ে দিতে বাধ্য হল গোপীন।

কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে হাতে একটা লাঠি নিয়ে এগিয়ে চলল বিষেণরাম। আমরা তাকে অনুসরণ করি।

পাহাড় বেয়ে উঠতে থাকি আমরা। শাল ও পিয়াশাল গাছের ঘন বন। বনের মধ্যে স্পষ্ট কোন পথ চোখে পড়ে না—অস্পষ্ট পথের আভাস পাই কাঁটা-

ঝোপ ও ঘাসবনের মধ্য দিয়ে। হরিণের পায়ে পায়েই বোধহয় এ পথের সৃষ্টি।

লাঠি ভর দিয়ে ঠুক ঠুক করে হাঁটে বিষেণরাম—কাঁটাঝোপের ওপরে লাঠি বুলিয়ে প্রতিপদে পথটাকে যেন অনুভব করে নেয় সে।

ঠিক পথে যাচ্ছ তো বিষেণরাম?—গোপীন প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ হুজুর।—মৃদু হেসে জবাব দিল বিষেণরাম।—এই একটাই পথ···

—কই পথ তো কিছু চোখে পড়ছে না···

—চোখে পড়ার মত পথ নয় হুজুর—পা ফেলে ফেলে চিনে নিতে হয়···

চড়াই বেয়ে যত উঠি আমরা, বন ততই গভীর হয়ে ওঠে—হাঁটতে রীতিমত কষ্ট হয়। হঠাৎ একটি আতগুীলতার ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে একটি বড়ো আকারের হরিণ—তার প্রকাণ্ড এক জোড়া শিং, প্রতিটি শিং ছ'টি করে শাখায় বিভক্ত। এমন বাহারের শিং আগে কখনো দেখিনি। দৌলত ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, এই হচ্ছে বারশিঙ্গা।



হরিণটা আমাদের দেখেও পালায় না—লতাপাতার আড়াল থেকে অবাক চোখে চেয়ে থাকে শুধু আমাদের দিকে। আশ্চর্য সুন্দর তার চোখ দু'টি। নিবিড় কালো চোখের তারায় যেন ঝর্ণার জলের স্বচ্ছতা।

খানিকক্ষণ থাকার পর হরিণটি পাহাড়ের চড়াই বেয়ে উঠতে থাকে। বিষেণরাম বললে, ওর পেছনে পেছনে চলুন আপনারা—আর একটু দূরে ওদের আস্তানা।

ঠিকই বলেছিল বিষেণরাম। হরিণটিকে অনুসরণ করে কয়েক শো ফুট এগিয়ে যেতেই একটা জলার ধারে গিয়ে পৌঁছলাম আমরা।

জলার পশ্চিমদিকে ঘন ঘাসবনের মধ্যে চরে বেড়াচ্ছিল একদল বারশিঙ্গা—সংখ্যায় প্রায় একশো দেড়শো হবে।

জোট বেঁধে থাকা এত বড় হরিণের পাল আগে কখনো দেখি নি। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি তাদের দিকে।

তাদের গায়ের চামড়ার বাদামী রং, গাছের শাখাপ্রশাখার মত শিংয়ের বাহার বনের সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে গিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছিল যেন বনের গাছগুলিই সজীব হয়ে উঠে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে।

জলার ধারে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ঘুরে ঘুরে তারা ঘাস খাচ্ছিল। এতগুলো হরিণের এমনি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল আমাদের।

কিন্তু অচিরেই বিঘ্নিত হল এই শান্তি। হঠাৎ দল থেকে বেরিয়ে এল দু'টি পুরুষ হরিণ—লড়াই শুরু করে দিল তারা অজ্ঞাত প্ররোচনাতে।

দু'জনেই শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসে পরস্পরের দিকে—তারপর শিঙে শিং ঠেকিয়ে যেন শিংয়ের জোর পরখ করতে থাকে।

দৌলত বললে, গায়ের জোর যাচাই করছে ওরা—যার জোর বেশি, সে-ই হবে দলের নেতা।

মৃদু হেসে বিষেণরাম বললে, এ ধরনের লড়াই প্রায়ই হয়···দু'তিন দিন অন্তর অন্তর এরা এদের নেতা বদলায়।

গোপীন প্রশ্ন করল, কতক্ষণ চলবে লড়াই ?

—তা বলতে পারব না···তবে ঘণ্টা দুয়েকের কম নয়।

—ঠিক আছে, লড়াই চলুক—ততক্ষণে আমরা বকসাইট দেখে আসি।···

বকসাইটের স্তূপটিকে পরীক্ষা করে আবার আমরা জলার ধারে ফিরে এলাম। হরিণ দু'টির লড়াই তখন থেমে গিয়েছে। কে জিতেছে বোঝা গেল না—তবু আবার আগেকার মত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চরে বেড়াতে শুরু করেছে তারা।

পাহাড় থেকে নেমে আসতে আমাদের সন্ধ্যা হয়ে গেল। বনবিভাগের বিশ্রাম-গৃহের কাছাকাছি গিয়ে আমরা পৌঁছতেই বিষেণরাম বিদায় নিল আমাদের কাছ থেকে।

বিষেণরাম চলে যেতেই দৌলত মৃদু হেসে বললে, বারশিঙ্গার লড়াই দেখে এখানকার ফরেস্ট রেঞ্জার চতুরলাল চতুর্বেদী বিষেণরামকে লড়িয়েছিলেন তার বন্ধু শিউশরণের সঙ্গে।

কেন ?—আমি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম।

—এই ফরেস্ট বাংলোতে আগে যে চৌকিদারের কাজ করত, সেই বুড়োটা হঠাৎ মারা যেতে এদের দু'জনের মধ্যে একজনকে ফরেস্ট বাংলোর চৌকিদারের কাজে বহাল করতে হুকুম দিয়েছিলেন ডি এফ ও সাহেব। এরা দু'জনেই ফরেস্ট বাংলোতে মালীর কাজ করত—দু'জনকেই চাকরির জন্য সমান যোগ্য বলে বিবেচনা করেছিলেন রেঞ্জার সাহেব। দু'জনের মধ্যে কাকে চাকরিটা দেবেন ঠিক করতে পারছিলেন না তিনি। এমন সময় পাহাড়ের ওপরের ঐ জলার ধারে বারশিঙ্গাদের লড়াই দেখার সুযোগ হল তাঁর···তারপরই তিনি বিষেণরাম ও শিউশরণকে কুস্তি লড়তে হুকুম দিলেন।

—লড়াইয়ে বিষেণরাম জিতেছিল নিশ্চয়ই···

না হুজুর না। মুচকি হেসে বললে দৌলত।—লড়াইয়ে হার হয়েছিল বিষেণরামের···

হেরে গিয়েও চাকরিটা পেল কি করে সে!—হতবুদ্ধির মত তাকালাম আমি দৌলতের মুখের পানে।

—শিউশরণ চাকরিটা নিল না যে!

—নিল না কেন?

—চাকরির সঙ্গে শিউশরণ বুড়ো চৌকিদারের মেয়ে রাধাকেও পেতে চেয়েছিল—কিন্তু রাধা বলল, সে হেরে যাওয়া বিষেণরামকেই বিয়ে করবে। তখন মনের দুঃখে এখান থেকে চলে গেল শিউশরণ···কোথায় গেল তা জানে না কেউ ···তারপর বিষেণরামই পেয়ে গেল চাকরিটা।

॥ ষোল ॥

স্বভাব পলাতক পশুদের মধ্যে সবচেয়ে বিচিত্র হচ্ছে বুনো গাধা। বুনো গাধা দেখা যায় কচ্ছে।

কচ্ছ গুজরাটে কাথিয়াওয়াড়ের উত্তরে যেন একটা দ্বীপ। তার পশ্চিমে ও দক্ষিণে সমুদ্র, পূর্বে এবং উত্তর দিকে লোনা জলের খাঁড়ি। এই খাঁড়ি দশ-বারো মাইল থেকে শুরু করে ষাট মাইল পর্যন্ত প্রশস্ত। সমুদ্রেরই বিচ্ছিন্ন অংশ। সমুদ্রের জল তার মধ্যে না ঢুকলেও বর্ষা থেকে আরম্ভ করে বছরের প্রায় ছ-সাত মাস সমুদ্রোপম জলার আকার নেয়। আবার মার্চ মাস থেকে জলহীন লবণাক্ত বালির বিস্তারকে মরুভূমি বলে মনে হয়। আরব সাগরের লাগোয়া তার পশ্চিম দিকের অংশটি অবশ্য বারো মাসই জলে ভরে থাকে।

জল থাকুক বা না থাকুক, দেখে সমুদ্র বা মরুভূমি যা-ই মনে হোক না কেন, এই খাঁড়িকে বলে কচ্ছের রান (**Rann of Cutch**)। কচ্ছের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তরে তার বিপুল প্রসারের জন্য তাকে বলা হয় **'Great Rann of Cutch'** এবং পূর্বদিকের অপ্রশস্ত অংশকে বলে **'Little Rann of Cutch'**। বর্ষায় জলের ছোপ ধরলেও লিট্‌ল্ রানকে ডাঙারই অংশ বলে মনে হয়। তার ওপর দিয়ে রেলপথ ও রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। বর্ষায় তা জলার আকার ধারণ করলেও রাস্তা বা রেলপথ কদাচিৎ জলে ডুবে যায়।

সুরজিৎ কচ্ছে এসেছে সুপেয় জলের উৎস সন্ধানে। ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগের নির্দেশে এই কাজ করছে সে।

তার সুপারিশ অনুযায়ী কচ্ছের ছোট রানের কাছে এক জায়গায় নলকূপ খোঁড়ার আয়োজন হচ্ছে, এমন সময় একটি চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সের কিশোর এল সুরজিতের সঙ্গে দেখা করতে। তার পরনে ময়লা পায়জামা ও গুজরাটী কোর্তা এবং সে মাথায় এঁটেছে একটি গেরুয়া রঙের পাগড়ি। সুরজিতের তাঁবুর মধ্যে ঢুকে সে তাকে বললে, টিউকল খুঁড়ছেন খুঁড়ুন, কিন্তু এখানে যে কয়েকটি মিঠে পানির 'নিপট' (হ্রদ) আছে, তাদের দিকেও নজর দিন।

মিঠে পানির নিপট!—সুরজিতের চোখদু'টি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে—কই, আমি তো একটাও খুঁজে পাই নি। গত দু'মাস ধরে ঘোরাঘুরি করছি এ অঞ্চলে—

খুঁজে কি আমিই পেয়েছি!—ছেলেটি মৃদু হেসে বললে, বুনো গাধাদের পেছনে পেছনে না ঘুরলে কি আর হদিস পেতাম মিঠে পানির নিপটের!

—বুনো গাধা আছে নাকি এখানে?

—এখানে ঠিক নয়, এখান থেকে কিছু দূরে ছোট রানের বালির মধ্যে ছোট একটুকরো ঘাসে ছাওয়া ডাঙা দ্বীপের মত জেগে আছে। একদল বুনো গাধা থাকে ওখানে। চারদিকে উঁচু বালিয়াড়ি পাঁচিলের মত ঘিরে আছে বলে গাধাদের এই গোপন আস্তানার খবর এখানকার লোকেরা রাখে না।

—এখানকার লোকেরা রাখে না তো তুমি পেলে কী করে?

মুচকি হেসে ছেলেটি বললে, ঐ গাধার দলের মধ্যে একটির সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গিয়েছে কিনা, সে-ই আমাকে নিয়ে গিয়েছে ওদের আস্তানাতে।

বুনো গাধার সঙ্গে তোমার ভাব হয়ে গিয়েছে!—ছানাবড়ার মত হয়ে ওঠে সুরজিতের চোখদু'টো।

ই. পি. গী.-র বইয়ে সুরজিং কচ্ছের এই বুনো গাধাদের বৃত্তান্ত পড়েছে। অত্যন্ত দুর্লভ প্রাণী। কচ্ছ ছাড়া পাকিস্তান ও পারস্যে তাদের দেখা যায়। পাকিস্তানে যাদের দেখা যায়, তারা অবশ্য কচ্ছেরই গাধা। চরতে চরতে রান পেরিয়ে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের সীমানা পেরিয়ে যায়, আবার ফিরে আসে কচ্ছে। ভারত, পাকিস্তান ও পারস্যের বন্য প্রাণী সংরক্ষণ বিভাগ তাদের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্যে খুবই তৎপর। কিন্তু তাঁদের তৎপরতা সত্ত্বেও বন্য গাধার সংখ্যা কমে আসছে। কমতে কমতে পারস্যে প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। কচ্ছ ও পাকিস্তানে তাদের লোপ পাবার সম্ভাবনা অবশ্য নেই, যদিও সংখ্যায় ক্রমশঃ কমে আসছে।

বুনো গাধা একেবারে যাতে লোপ পেয়ে না যায় তার জন্যে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ বিভাগ তাদের ধরে চিড়িয়াখানায় রাখার পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু পরিকল্পনাকে কাজে লাগাতে গিয়ে দেখা গেছে, বন্য গাধাকে বন্দী করা খুবই কঠিন। তাদের কাছাকাছি কেউ গেলেই তারা পালিয়ে যায়—রানের বালির ওপর দিয়ে ঘণ্টায় বত্রিশ-চৌত্রিশ মাইল গতিতে দৌড়তে থাকে। জীপে চেপে তাদের অনুসরণ করেও তাদের নাগাল পাওয়া যায় না। বনের খুব কম জন্তুই এমন দ্রুতগতিতে দৌড়তে পারে। দ্রুতগতির চেয়ে বড় কথা হচ্ছে তাদের স্বাধীনতার স্পৃহা। বন্যপ্রাণী মাত্রই অবশ্য স্বাধীনতা ভালবাসে। কিন্তু স্বাধীনভাবে প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে বিচরণের এমন দুর্বার আকাঙ্ক্ষা বোধ হয় অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় না। কচ্ছের রান এমন একটি জায়গা, যেখানে মাইলের পর মাইল ধূ ধূ করা বালির বিস্তারের মধ্যে আছে অবাধ মুক্তির প্রতিশ্রুতি। মানুষের বসতি ওখানে নেই বললেই চলে, কাজেই মানুষের দরুন ওদের স্বাধীন বিচরণে কিছু ব্যাঘাত ঘটে না।

এহেন বন্য গাধাকে ঐ বালকটি বশ মানালে কী করে ভেবে পায় না সুরজিৎ।

মুখ টিপে হেসে সুরজিৎ বললে, ঠিক আছে, চল দেখে আসি তোমার মিঠে পানির নিপট।

—আমি তো দেখাব না, দেখাবে ঐ বুনো গাধাটা। রানের ধারে চরতে চরতে ওরা নিপটে গিয়ে জল খায়। ওদের সঙ্গে যাব আমরা।

—ঠিক আছে, চল আগে তোমার গাধাদের আস্তানাতেই যাই।

—আমাকে কী ইনাম দেবেন ?

—তুমি যা চাইবে তাই দেব। চল।

—এখন নয় স্যার, রাত্রে যাব। রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে যাব, যাতে ওরা টের পেয়ে না যায়।

—ওরা কারা ?

ঐ যে যারা বুনো গাধাদের ধরে বেঁধে চিড়িয়াখানার মধ্যে জীইয়ে রাখতে চায়।—চাপা গলায় বললে ছেলেটা, ওরা ভাবে, ওদের ধরে রাখলেই বুঝি ওরা বেঁচে যাবে। যারা ফাঁকা রানের মধ্যে মাইলের পর মাইল দৌড়োদৌড়ি করে বেড়ায়, তাদের চিড়িয়াখানার খাঁচার মধ্যে বেঁধে রাখলে দু'দিনও বাঁচবে না তারা।

সেদিন অনেক রাত্রে ছেলেটা এল। সুরজিৎ তৈরি হয়েই বসে ছিল তার তাঁবুর মধ্যে। ছেলেটির ডাকাডাকিতে বেরিয়ে আসে। ছেলেটির পরনে শুধু পায়জামা, খালি গা। সুরজিত বললে, ব্যাপার কী ? জামা ছেড়ে এসেছ কেন ?

সলজ্জ হেসে ছেলেটি বললে, জামাটামা ওরা সইতে পারে না কিনা, তাই।

—জামা ছেড়ে ফেললেই কি ওরা তোমাকে ওদের একজন ভাবতে শুরু করবে ?

—না, তা ঠিক নয়। তবে পোশাক ছেড়ে ফেললে ওরা আমাকে মানুষ না ভেবে কোন জন্তু-জানোয়ার বলে মনে করে।

—অন্য জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে কোন শত্রু নেই ওদের ? যেমন ধরো, নেকড়ে বা চিতা বাঘ ?

—চিতাবাঘ এখানে নেই, তবে নেকড়ে আছে। মানুষের চেয়ে ওরা নেকড়েকেই বেশি ভয় পায়। কিন্তু আমাকে দেখে তো ওদের নেকড়ে বলে ভুল হবে না। আমার মনে হয়, ওরা আমাকে বাঁদর বা উল্লুক জাতের কিছু বলে মনে করে! —বলতে বলতে ছেলেটি হেসে ফেলল।

ছেলেটিকে নিয়ে তার জীপে উঠে সুরজিৎ বললে, তোমার নাম কী ?

ছেলেটি বললে, আমার নাম রতনলাল ওঝা। কিন্তু ওদের সামনে আমাকে নাম ধরে ডাকবেন না যেন স্যার।

—তবে কি কান ধরে ডাকব ?

খিলখিল করে হেসে উঠে রতন বললে, ডাকাডাকি করার কোন দরকারই

হবে না স্যার। ওদের দলে আমি ভিড়ে পড়ার পর আপনি শুধু আমাদের পেছনে পেছনে আসবেন।

সুরজিৎ অবাক হয়ে বললে, তোমাদের পেছনে পেছনে গেলেই মিঠে পানির নিকটে পৌঁছে যাব!

—হ্যাঁ হুজুর। ওরা চরতে চরতে নিপটে যাবে জল খেতে।

জীপে স্টার্ট দিয়ে সুরজিৎ বললে, তুমি কি ঐ নিপটে যাওনি রতন?

রতন বললে, গিয়েছি বইকি, ওদের সঙ্গেই গিয়েছি। নইলে ঐ নিপটের কথা আমি জানলাম কী করে?

—তাহলে তুমিই তো আমাকে নিয়ে যেতে পার ওখানে। ঐ বুনো গাধাদের সঙ্গে যাবার দরকার কী?

—ওদের সঙ্গে না গেলে আমি নিপট খুঁজে বের করতে পারব না স্যার। রোজ রোজ ওখানে গেলেও ও জায়গাটা খুঁজে বের করার সাধ্য আমার নেই।

—কেন বল তো?

—ঝুটো নিপট দিয়ে রানটা ভর্তি হয়ে আছে। যেদিকে তাকাবেন, নিপটের জল যেন আপনাকে হাতছানি দেবে। এদের মধ্যে সাচ্চা নিপট খুঁজে বের করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় স্যার।

তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি নে।—সুরজিৎ অবাক হয়ে বললে, ঝুটো নিপট আবার কী?

মরীচিকা স্যার—রতন ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, রান তো মরুভূমির মত। রানের ওপর দিয়ে গেলেই দেখবেন, একটানা বালি ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু বালি ছাড়া আর কিছু না থাকলেও সব জায়গায় জল দেখবেন। মনে হবে, যেন কাচের মত ঝলমল করছে নিপটের জল। রানের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে করতে আপনার তেষ্টা পেয়ে যাবে ঠিক। তখন ঐ ঝুটো জলের পেছনে পেছনে দৌড়ে হয়রান হবেন। এইসব ঝুটো জলের মধ্যে কোথায় আছে সাচ্চা নিপট, রোজ রোজ ওখানে গেলেও তা খুঁজে বের করার সাধ্য কোন মানুষের নেই।

—মানুষের যা অসাধ্য তা ঐ বুনো গাধারা করে কী করে? মরীচিকা ওদের ভোলায় না?

—না হুজুর। ওরা রানের জানোয়ার, রানের মধ্যে কোন্‌টা সাচ্চা, কোন্‌টা ঝুটো তা ওরা চেনে।

এর পর আর কোন কথা না বলে সুরজিৎ জীপ চালাতে থাকে। রতনের নির্দেশে জীপটাকে সে রানের বালির মধ্যে নামায়। শক্ত জমাট-বাঁধা বালি, কাজেই গাড়ি চালাতে কোন অসুবিধা হয় না।

আকাশে চাঁদ নেই। তবু অন্ধকার তেমন কালো নয়। কারণ স্বচ্ছ আকাশে

ঝলমল করছে লক্ষ লক্ষ তারা। আকাশ-জোড়া তারকাপুঞ্জ থেকে যে অস্পষ্ট আলো নেমে আসছে তা অন্ধকারকে ফিকে করে দিয়ে রানের বালিকে উদ্ভাসিত করেছে। রতনের নির্দেশে জীপের হেড লাইটের আলো নিভিয়ে দিলেও রানের বালি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সুরজিৎ।

কোন্ দিকে যাব ?—সুরজিৎ প্রশ্ন করল।

গলার স্বর নামিয়ে কথা বলুন স্যার।—মৃদু স্বরে বলে উঠল রতন, মানুষের গলার স্বর শুনলেই ওরা পালাবে। আপনি সোজা উত্তর দিকে গাড়ী চালান।

উত্তর দিক বুঝব কী করে ?—চাপা গলায় বললেও সুরজিতের বিরক্তি চাপা থাকে না।

—আকাশে ধ্রুবতাবা আছে···ঐ যে দেখুন···ঐ ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করে গাড়ি চালান।

—বালির মধ্যে কোথাও চোরাবালি নেই তো রতন ?

—থাকতেও পারে। খুব সাবধান!

—থাকলে চিনব কী করে ?

—সাদা বালির মধ্যে জায়গায় জায়গায় কালো ছোপ পড়েছে, ওগুলোই হচ্ছে চোরাবালি।

—অন্ধকারের মধ্যে কালো ছোপগুলো চিনতে পারব তো ?

—আপনি চিনতে না পারলেও আমি পারব চিনতে। কোন ভয় নেই, নির্ভয়ে আপনি গাড়ি চালিয়ে যান।

গাড়ি চালিয়ে যায় সুরজিৎ, অবশ্য নির্ভয়ে নয়। কালো ছোপ সম্পর্কে সতর্ক হতে বলেছে রতন। কিন্তু সাদা বালির ওপরে অন্ধকার যেন একটা স্বচ্ছ কালো চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। তার মধ্য দিয়ে বালির আভাস পেলেও কোন রকম কালো ছোপ চোখ পড়বে বলে মনে হচ্ছে না। কাজেই রীতিমত ভয়ে ভয়ে গাড়ি চালাতে থাকে সুরজিৎ।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর একটা উঁচু বালিয়াড়ির কাছে এলো ওরা। রতনের ইঙ্গিতে জীপ থামিয়ে নেমে পড়ে সুরজিৎ। তারপর রতনকে অনুসরণ করে বালিয়াড়ির দিকে এগিয়ে যায় সে।

বালিয়াড়িটা যেন ছোটখাটো একটা টিলা। তার নীচে এসে রতন ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন স্যার, আমি এগিয়ে যাই।

কোথায় ?—সুরজিৎ উৎসুক স্বরে প্রশ্ন করে।

—এখান থেকে একটু দূরে ওদের আস্তানা, আমি ওখানে যাব এখন। ভোরের আলো যতক্ষণ না-ফুটে উঠছে ততক্ষণ আপনাকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে। তারপর ওরা যখন চরতে শুরু করবে, আপনি একটু তফাৎ থেকে ওদের

পেছনে পেছনে যাবেন জীপে করে। চরতে চরতে ওরা মিঠে পানির নিকটে পৌঁছে যাবে।

—তুমিও ওদের সঙ্গে চরবে নাকি ?

—হ্যাঁ স্যার।

—কিন্তু ওরা তো প্রচণ্ড বেগে দৌড়োয় শুনেছি, ঘণ্টায় প্রায় ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল। ওরা যদি দৌড়োতে শুরু করে, ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তুমি দৌড়োবে কী করে ?

—আমি আমার 'বাতাসী'-র পিঠে চেপে দৌড়োব, কাজেই ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে আমার কোন অসুবিধে হবে না।

—তোমার 'বাতাসী'! সে আবার কে ?

সলজ্জ হেসে রতন বললে, ঐ যে আপনাকে বলেছিলাম না যে, একটা বুনো গাধার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গিয়েছে. আমি তার নাম দিয়েছি বাতাসী। আর কোন কথা নয় স্যার, আমি চলি। আপনি এই টিলার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকুন।

তা-ই থাকে সুরজিৎ। রতন চলে যাওয়ার পর টিলার পিছনে নিজেকে আড়াল করে সে তার দূরবীন বের করে। দূরবীন চোখে এ'টে দেখে সে কোথায় যাচ্ছে। বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় আধ মাইল দূরে একটা ঘাসে ছাওয়া জমিতে গিয়ে পৌঁছয় রতন। জমিটা রানের বালির মধ্যে যেন ছোটখাট একটা দ্বীপ।

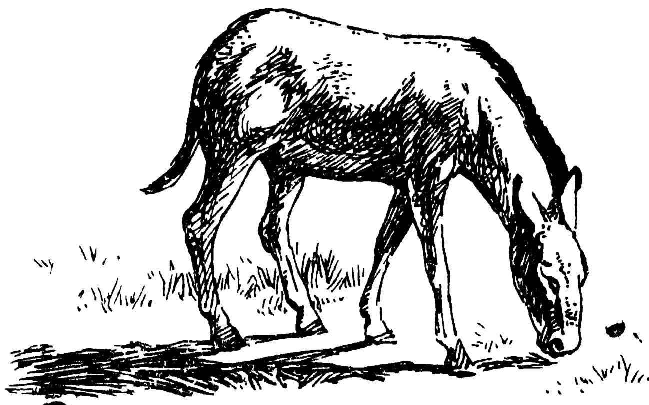
রানের সমতল থেকে জমিটা একটু উঁচুতে। ওখানে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকায় রতন। তারপর সে এগিয়ে যায়। কয়েক পা এগোতেই কারা যেন তার দিকে এগিয়ে আসে। অন্ধকারে তাদের শরীরের আদল ফুটে না উঠলেও সুরজিৎ বুঝতে পারে যে, এরাই হচ্ছে বুনো গাধা।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই ওদের দেখতে পায় সুরজিৎ। পাশাপাশি দশ-বারোটা গাধা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, তাদের সঙ্গে রতনও নড়েচড়ে। গাধাদের সঙ্গে তাকে তফাত করা যাচ্ছে না। গাধাদের দলে সেও যেন একটি গাধা।

গাধা হলেও পুরোপুরি গাধা যেন নয় এরা। গাধার চেয়ে আকারে কিছুটা বড়, উজ্জ্বল বালির মত রঙ, ঘাড়ের ওপরে কেশরের রঙ গাঢ় বাদামী। এই গাঢ় বাদামী রঙ সারা পিঠ জুড়ে প্রসারিত। নিম্নাঙ্গ সাদা, জায়গায় জায়গায় হলদে রঙের ছোপ। মোটামুটি এমনি তাদের গায়ের রঙ যে, অনায়াসে রান বা মরুভূমির বালির মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে তারা। বন্য প্রাণী বিশেষজ্ঞ ই. পি. গী.-র মতে, রানের বালির মধ্যে গা ঢাকা দিয়েই এরা আত্মসংরক্ষণে সমর্থ হয়েছে। তাঁর হিসাবে মোট প্রায় ন'শটি বুনো গাধা কচ্ছের রানের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে।

রানের ওপারে পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধু প্রদেশে আছে দশ-পনেরোটি, কিন্তু তাদের সঙ্গে কচ্ছের রানের গাধাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। কচ্ছের রান থেকেই ওরা ওখানে গিয়েছে বলে মনে হয়।

দিনের আলো ফুটে উঠতে চরতে শুরু করেছে গাধারা। চরতে চরতে চলেছে। সুন্দর তাদের চলার ভঙ্গী। চালচলনে সাধারণ গাধার সঙ্গে কোন মিল নেই ওদের।



কিছুক্ষণ বাদে ঐ উঁচু জমিটা থেকে বালির মধ্যে নেমে এল তারা। ইতিমধ্যে রতন তার গাধাটির পিঠে চেপে বসেছে। বোধহয়, ঐ গাধাটিরই সে নাম দিয়েছে 'বাতাসী'।

বালির ওপর দিয়ে চলেছে ওরা। এর পরই হয়তো দৌড়োতে শুরু করবে। সুরজিৎ তাড়াতাড়ি তার জীপের কাছে চলে এল। জীপের চালকের আসনে উঠতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় সে। চালকের আসনে চামড়ার জ্যাকেট ও ব্রীচেস পরা একজন রাজস্থানী যুবক বসে সিগারেট খাচ্ছে। তার কোমরের বেল্টে পিস্তল ঝুলছে। সুজিৎকে দেখে সে মৃদু হেসে বললে, আসুন স্যার, আমি আপনার ড্রাইভারের কাজ করি, এই রানের উপর দিয়ে গাড়ি চালানো আপনার কর্ম নয়।

—কিন্তু আপনি ?

আমি যেই হই, রানের ডাকু নই!—হাসতে হাসতে বলে যুবকটি।

—কিন্তু এখানে এলেন কী করে ?

—আপনার জীপে করেই এসেছি। আপনার তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে রতনের সঙ্গে আপনার কথাবার্তা শুনে ঠিক করেছিলাম, লুকিয়ে যাব আপনাদের সঙ্গে। তাই রাত্রে আপনারা জীপে চড়ার আগেই আমি সীটের পিছনে তেরপলের আড়ালে লুকিয়ে পড়ি।

সুরজিৎ বললে, আপনিই তাহলে সেই 'গাধা-ধরা', আপনার চোখে ধুলো দেবার জন্যেই রতন রাতের অন্ধকারে আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে !

যুবকটি হো হো করে হেসে উঠে বললে, রতন আমাকে 'গাধা-ধরা' বলেছে বুঝি ! ঠিকই বলেছে অবশ্য, আমি সত্যিই একটি বুনো গাধাকে ধরে পোষ মানাতে চাই। এখন আর কোন কথা নয় স্যার, গাধার দল যাতে নজরের বাইরে চলে না যায়, তার জন্যে ওদের পেছনে পেছনে যেতে হবে। একটু তফাতে থেকে যেতে হবে, আমরা যে ওদের অনুসরণ করছি তা টের পেলেই পালাবে ওরা।

গাধার দল তখন রানের বালির ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করেছে। তাদের অনুসরণ করে চলে সুরজিতের জীপ। রানের বালি প্রায় পীচের মত জমাট বেঁধে আছে। তাই জীপ চালাতে কোন অসুবিধে হয় না।

রাজস্থানী যুবকটির মুখের দিকে তাকিয়ে সুরজিৎ বললে, আপনার পরিচয় জানতে পারি ?

নিশ্চয়ই।—যুবকটি জবাব দিল, আমি গুজরাটের বন-বিভাগের গবেষণা বিভাগে কাজ করছি, আমার নাম রঘুরাজ রাঠোর। সকলে বলে বুনো গাধাকে পোষ মানানো অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করব আমি। একটা গাধাও যদি ধরতে পারি—

তার মুখের কথা মুখেই থেকে যায়, গাধার দলের মধ্যে বিস্ময়কর কিছু বোধ হয় তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সে সামনের দিকে, বাড়িয়ে দেয় জীপের গতি।

জীপের স্পীড বাড়ালেন কেন ?—চাপা কণ্ঠে বলে উঠল সুরজিৎ, টের পেলে ওরা পালিয়ে যাবে যে !

দেখছেন, রতন একটা গাধার পিঠে চেপে বসেছে !—চাপা উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল রঘুরাজ, ঐ গাধাটাকে ও পোষ মানিয়েছে নাকি !

—পোষ মানিয়েছে কি-না জানি না, তবে রতনের সঙ্গে গাধাটির খুব ভাব হয়ে গিয়েছে। রতন ওর নাম দিয়েছে 'বাতাসী'।

—রতনের সঙ্গে যখন ওর ভাব হয়ে গিয়েছে, তখন আর কোন অসুবিধে নেই।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে একটানা রানের ওপর দিয়ে দৌড়োবার পর গাধার দল একটি বালিয়াড়িবেষ্টিত জায়গায় এসে দাঁড়াল। বালিয়াড়ির ওপাশে গাছপালা দেখা যাচ্ছে। রঘুরাজ বললে, ওখানে একটা হ্রদ আছে।

এটাই বোধ হয় রতনের মিঠে পানির নিপট !—সুরজিৎ উৎসুক কণ্ঠে বলে উঠল।

—তা হতে পারে।

যাই আমি দেখে আসি।—বলে সুরজিৎ জীপ থেকে নামল।

রঘুরাজ বললে, যান, দেখে আসুন, আমি আপনার গাড়ি পাহারা দিচ্ছি।

বালিয়াড়ি পেরিয়ে যেতেই এক আশ্চর্য দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হল সুরজিতের চোখের সামনে। বালিয়াড়ি দিয়ে ঘেরা ছোট একটি হ্রদ। রোদে ঝলমল করছে তার জল। নীলার মত নীল জলের রঙ। জলের ধারে দু-চারটে খেজুর গাছ। গাধার দল জলের মধ্যে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে জল খাচ্ছে। বাতাসীও জল খাচ্ছে। রতন তার পিঠে বসে।

দূরবীন দিয়ে হ্রদটাকে দেখে সুরজিৎ। হ্রদের জল মিষ্টি কি-না তা এত দূর থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। তবে গাধারা যেমন পরিতৃপ্তির সঙ্গে জল খাচ্ছে, তা থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, জলের স্বাদ লোনা নয়।

লোনা বালি দিয়ে ঘেরা মিঠে জল অবশ্যই বিস্ময়কর। কিন্তু তার চেয়েও বেশি চিত্তাকর্ষক ঐ গাধার দল। জলের চেয়ে তাদের দিকেই বেশি নজর দেয় সুরজিৎ। গৃহপালিত পোষ মানা গাধাকে কখনো তার সুন্দর বলে মনে হয়নি। কিন্তু এই বন্য গাধাদের যেন সহজাত একটা সৌন্দর্য আছে। তাদের চলাফেরা, নড়াচড়া, জল খাওয়া—সবই ভারি সুন্দর। মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে সে ওদের দিকে।

হঠাৎ জীপের আওয়াজে সে চমকে ওঠে। তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তার জীপটা। কী করে বালিয়াড়ি পেরিয়ে জীপটাকে হ্রদের ধারে নিয়ে এসেছে রঘুরাজ তা বুঝতে পারে না সুরজিৎ। সে রঘুরাজের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই রঘুরাজ তাকে জীপে উঠে আসতে ইঙ্গিত করে।

সুরজিৎ তার জীপে চড়তে গিয়ে দেখে যে, আর একটা জীপ তার জীপটাকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসছে। গুজরাটের বন বিভাগের চিহ্ন আঁকা জীপটার হুড খুলে ফেলা হয়েছে। হুড লাগাবার লোহার রডের ফ্রেমটাও খোলা। অর্থাৎ সোজা হয়ে অন্ততঃ দু'জন যাতে দাঁড়াতে পারে সে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঐ জীপের চালকের পেছনে বসে আছে দু'জন লোক। তাদের হাতে বন্দুক ও মস্ত বড় একটা দড়ির বাণ্ডিল।

সুরজিৎ বললে, ওটা বোধ হয় আপনারই জীপ?

রঘুরাজ জবাব দিল, হ্যাঁ, আমাদের পেছনে পেছনেই আসছিল।

—কই আমি তো—

কথা বলবেন না।—চাপা ধমক দিয়ে ওঠে রঘুরাজ, মানুষের গলার স্বর শুনলেই ওরা পালাবে। নিন, এই যন্ত্রটা ধরুন।

বলে একটা ছোট পোর্টেবল অ্যাম্প্লিফায়ার সুরজিতের হাতে ধরিয়ে দেয় রঘুরাজ। এটার সঙ্গে তার দিয়ে লাগানো মাইকটা থাকে তার নিজের হাতে।

জীপটা সোজা গাধার দলের দিকে চালিয়ে দেয় রঘুরাজ। পেছনে পেছনে অন্য জীপটাও আসছে।

ছত্রভঙ্গ হয়ে গাধার দল ছুটে চলে রানের ওপর দিয়ে। বাতাসীও ছোটে। তার পিঠে বাতাসীর ঘাড় ধরে বসে আছে রতন। তার মুখের ভাব কঠোর। মুখ ফিরিয়ে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে সুরজিতের জীপের দিকে। তারপর আর কখনোই সে তাকায় না পেছন দিকে। গাধার পিঠের ওপরে দু'হাত রেখে সে যেন তার অনুসরণকারীদের খপ্পর থেকে তাকে বাঁচাবার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে।

দলের আর সব গাধাকে ছেড়ে দিয়ে রঘুরাজ বাতাসীকে অনুসরণ করে। রানের জমাট-বাঁধা বালির ওপর দিয়ে যথাসম্ভব জোরে জীপটাকে চালাতে থাকে রঘুরাজ। কিন্তু যত জোরেই জীপ চালাক না কেন সে বাতাসীকে ধরতে পারে না—বাতাসী জীপের চেয়েও জোরে যাচ্ছে।

জীপের স্পীডোমিটারের দিকে তাকিয়ে সুরজিৎ দেখে যে, ওর কাঁটা ত্রিশ ছুঁয়েছে। অর্থাৎ ত্রিশ মাইলের চেয়েও জোরে দৌড়োচ্ছে বাতাসী।

রঘুরাজ জীপের স্পীড় বাড়াতে চেষ্টা করে, কিন্তু বালির ওপর দিয়ে ত্রিশ মাইলের চেয়ে বেশী স্পীডে গাড়ি চালানো অসম্ভব ব্যাপার, তাই রঘুরাজ বাতাসীর নাগাল পায় না।

অ্যাম্প্লিফায়ারের মাইক্রোফোন মুখের কাছে তুলে এনে রঘুরাজ রতনের উদ্দেশে বলে, গাধাটাকে অত জোরে দৌড়োতে দিও না রতন, তুমি পড়ে যাবে। পড়ে গেলে বাঁচবে না!

অ্যাম্প্লিফায়ারের মাধ্যমে রঘুরাজের আবেদন প্রচণ্ড গর্জনের মত শোনায়। কিন্তু নিষ্ফল হয় তা। হয়তো বাতাসীর গতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রতনের নেই, কিংবা সে চায় না বাতাসী তার গতি কমাক।

বাতাসীর গতি বাড়তেই থাকে, জীপ ও বাতাসীর মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যায় ক্রমশঃ। সুরজিৎ বোঝে যে, বাতাসীকে অনুসরণ করে লাভ নেই। সে রঘুরাজকে বলে, ছেড়ে দিন মিস্টার রাঠোর। ওর নাগাল পাওয়া যাবে না।

পাওয়া যাবে না মানে!—রঘুরাজ রাঠোর কঠোর স্বরে বললে, ওকে আজ আমি ধরবই!

কিন্তু ও তো প্রায় ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ মাইল স্পীডে দৌড়োচ্ছে আর জীপের স্পীড ত্রিশ মাইলের বেশি তোলা যাচ্ছে না। কী করে ওকে ধরবেন মিস্টার রাঠোর?

মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে রঘুরাজ বললে, আর মাইল কয়েক গেলেই গ্রেট রান অব্ কাচ্। লিট্‌ল রানের মত তার জল শুকিয়ে যায়নি। গ্রেট রানের জলের ধারে

গিয়ে ওকে থামতেই হবে মিস্টার গুহ। তারপর…

—কী তারপর ?

—আমার লাখপত নামে একটি গ্রামের পাশ দিয়ে যাব। লাখপতে আমার ডিপার্টমেন্টের বারোজন গার্ড ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে। ওরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। গ্রেট রানের জলার ধারে ওদের নিয়ে আমরা বাতাসীকে ঘিরে ফেলব। তারপর ঐ জীপে আমার যে ট্র্যাপম্যান দড়ি-দড়া নিয়ে বসে আছে, সে তার দিকে দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে দেবে। আমার ট্র্যাপম্যান চতুরলাল খুবই চতুর ফাঁসুড়ে, দড়ির ফাঁস দিয়ে জানোয়ার ধরায় রীতিমত এক্সপার্ট। আফ্রিকার জঙ্গলে দড়ির ফাঁস দিয়ে জেব্রা ধরার অভিজ্ঞতা আছে তার।

—তাই নাকি !

—আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? ঠিক আছে, আর ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করুন, হাতেনাতে পেয়ে যাবেন চতুরলালের চাতুর্যের পরিচয়।

রানের বালির ওপর দিয়ে চলতে গিয়ে কোথায় লাখপত গ্রাম সুরজিৎ বুঝতে পারে না। আধ ঘণ্টা বাদে রঘুরাজ যখন বললে, তারা লাখপাতর কাছাকাছি এসে গেছে, তখন উঁচু বালিয়াড়ির আড়ালে কিছু গাছপালার আভাস পেল সুরজিৎ।

বালিয়াড়ি আড়ালে লুকিয়ে ছিল ঘোড়সওয়ারের দল। ছুটে আসে তারা। দুটো জীপের সঙ্গে বারোজন ঘোড়সওয়ার অনুসরণ করে বাতাসীকে। রতন একবার পেছন ফিরে দেখে নেয়। তারপর বাতাসীর গতি আরো বেড়ে যায়। সুরজিতের মনে হ'ল, সে যেন ঘণ্টায় প্রায় চল্লিশ মাইল বেগে দৌড়োচ্ছে।

কিন্তু যত জোরেই যাক না কেন, আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাকে থামতে হয়— ঢেউ-খেলানো বালি ও বালিয়াড়ির প্রান্তে ঝলমল করছে গ্রেট রানের জল ! সুরজিৎ ভেবেছিল, বুঝি মরীচিকার বিভ্রম, কিন্তু দুরবীন দিয়ে ভালো করে দেখে নিয়ে সে বুঝতে পারে, সত্যিই জলের কাছাকাছি এসে গিয়েছে তারা।

ইস্পাতের মত ঝকমক করছে বিপুল জলের বিস্তার। ওপারের পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশ এবং এপারে কচ্ছের মাঝখানে গ্রেট রান প্রায় ষাট মাইল চওড়া। সমুদ্রের মতই দেখাচ্ছে তাকে, ওপারটা দুরবীন দিয়েও দ্রষ্টব্য নয়।

জলের ধারে থমকে দাঁড়ায় বাতাসী। সুরজিৎ ও রঘুরাজের দুটো জীপ এবং দ্বাদশ ঘোড়সওয়ার এগিয়ে যায় তার দিকে এবং ক্রমশঃ ঘিরে ফেলতে থাকে তাকে।

অ্যাম্প্লিফায়ারের মধ্য দিয়ে রঘুরাজ রতনের উদ্দেশ্যে বলে, সামনে জল, আর এক পাও পারবে না এগিয়ে যেতে। কাজেই ধরা দাও। ধরা না দিলে দড়ি দিয়ে ধরে ফেলব আমরা তোমার গাধাটিকে।

রঘুরাজের আবেদনে কর্ণপাতও করে না রতন, বাতাসীর ঘাড়ের উপরে হাত-

দুটি চেপে ধরে স্থির হয়ে বসে থাকে সে। বাতাসীও দাঁড়িয়ে, কিন্তু তার সর্বাঙ্গে চাঞ্চল্যের স্পন্দন। সে যে ধরা পড়তে যাচ্ছে তা যেন বুঝতে পারে। অস্থির হয়ে ওঠে সে। ঘাড় তুলে চিৎকার করে। গৃহপালিত গাধার চেয়ে তীক্ষ্ণ ও তীব্র তার কণ্ঠস্বর।

রঘুরাজ বলে, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই চতুরলালের দড়ির ফাঁস তোমার বাতাসীকে বেঁধে ফেলবে। গাধার পিঠ থেকে এখনই নেমে এস রতন। তোমার কোন ভয় নেই, তোমাকে আমি একশো টাকা ইনাম···

রঘুরাজের কথা শেষ না হতেই ঘোড়সওয়াদের দল বাতাসীকে তিন দিক থেকে ঘিরে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে রঘুরাজের জীপও এগিয়ে যায়। জীপের পেছনে চতুরলাল উঠে দাঁড়ায় তার দড়ির বাণ্ডিল নিয়ে। তাতে আগে থেকেই ফাঁস লাগানো। ফাঁসটা আঁকড়ে ধরে চতুরলাল। সকলেই অপেক্ষা করে রুদ্ধশ্বাসে।

সহসা ঘটে গেল এক বিস্ময়কর ব্যাপার। বাতাসী এগিয়ে গেল জলের দিকে। রতন তার দু'হাত দিয়ে বাতাসীর গলা আঁকড়ে ধরে। হয়তো তার ইঙ্গিতেই জলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাতাসী।

কিন্তু ঐ সমুদ্রের মত দুস্তর জলরাশির মধ্য দিয়ে কোথায় যাচ্ছে ওরা? সুরজিৎ বললে, ওদের থামান মিস্টার রাঠোর!

কোথায় যাচ্ছিস রতন?—মাইকের মধ্য দিয়ে রঘুরাজের গলার স্বর আর্তনাদের মত বেজে ওঠে—জলে ডুবে মরবি যে!

রঘুরাজের অনুনয়ে কর্ণপাতও করে না রতন। বাতাসীর পিঠে চেপে সে জলের মধ্যে আরও এগিয়ে যায়।

ফিরে আয় রতন!—আর্ত অনুনয়ের স্বরে চীৎকার করতে থাকে রঘুরাজ—ভয় নেই তোর বাতাসীকে আমি ধরব না।

বাতাসী তখন জলের মধ্য দিয়ে তীরের বেগে ছুটে যাচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে রানের বিপুল জলরাশির বুকে বাতাসী ও রতন একটি কালো বিন্দুতে পরিণত হয়। তারপর আর তাদের দেখা যায় না।

॥ সতের ॥

রানের জলের মধ্যে একটি ছোট মোটর লঞ্চে করে অনেক খুঁজেছিল রঘুরাজ রাঠোর। কিন্তু বাতাসী ও রতনের কোন খোঁজ পায় নি। তার ধারণা রানের জলে ডুবে প্রাণ হারিয়েছে তারা। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা তার এই ধারণায় সায় দিতে পারে না। তারা বলে যে বুনো গাধারা দৌড়ানোর মত সাঁতারেও পটু। রতনকে পিঠে নিয়ে সাঁতার কেটে বাতাসী বোধ হয় রানের ওপারে চলে গিয়েছে।

রানের ওপার মানে পাকিস্তান। রঘুরাজ পাকিস্তানের বনবিভাগের প্রধান অধিকর্তার কাছে আবেদন জানায় রতন ও বাতাসীর খোঁজ নেওয়ার জন্য।

প্রায় বছরখানেক বাদে রঘুরাজ জবাব পায় তার চিঠির। পাকিস্তানের বন-বিভাগের প্রধান অধিকর্তা তাকে লেখেন ঃ

'আপনার চিঠি পাওয়ার পর বিস্তর খুঁজেছি আমরা—হানা দিয়েছি বুনো গাধাদের আস্তানায়। কিন্তু কোথাও পাই নি ওদের খোঁজ। যারা কেবল পালিয়ে বেড়ায়, তাদের খুঁজে পাওয়া কঠিন—হয়তো কখনোই পাব না আমরা ওদের সন্ধান। তবে সন্ধান না পেলেও দুঃখ করার কিছু নেই, কারণ বুনো গাধাদের জীবনীশক্তি অসাধারণ—তাদের ধরে ফেলা বা মেরে ফেলা দুই-ই অসম্ভব ব্যাপার। রানের জল কেন, সমুদ্রের জলও ডোবাতে পারবে না আপনাদের বাতাসীকে। বাতাসী বেঁচে থাকলে, রতনও বেঁচে থাকবে—কাজেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

এই চিঠি পাওয়ার পর রঘুরাজ কতখানি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিল জানি না। এর পর বাতাসী ও রতনের সন্ধান আর সে নেয় নি, কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ওদের সম্বন্ধে আর তার উদ্বেগ ছিল না। কিন্তু সে তার গবেষণার জন্য বন্য প্রাণিদের ধরে আনা বন্ধ করে দেয়।

গবেষণাকেন্দ্র পরিদর্শন করতে এসে বনবিভাগের অধিকর্তা রঘুরাজকে বললেন, বুনো জানোয়ার না ধরে এনে তোমাদের গবেষণা চলবে কী করে?

রঘুরাজ বললে, বনের মধ্যে বুনো জানোয়ারদের কাছাকাছি থেকে চালাব আমার গবেষণা।

—তোমার গবেষণাকেন্দ্রের আর সকলেরও কী তাই মত? অধিকর্তা প্রশ্ন করেন।

—আর সকলের কথা আমি জানি না। রঘুরাজ জবাব দেয়, আমি শুধু এইটুকু

জানি যে বন্যদের সম্বন্ধে জানতে হলে বন্য পরিবেশের মধ্যে দেখতে হবে তাদের। বন থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে এনে তাদের স্বভাব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই জানা যাবে না।

—গবেষণাকেন্দ্রের মধ্যে বন্য পরিবেশ সৃষ্টি করলেই তো হয়।

—শুধু বন্য পরিবেশ সৃষ্টি করলে হবে না, তাদের স্বাধীনতা দিতে হবে। সেটা তো আর এই গবেষণাকেন্দ্রের মধ্যে সম্ভব নয়।

—তা হলে কী এই গবেষণাকেন্দ্র তুমি তুলে দিতে চাও?

—হ্যাঁ। আমরা বনে বনে বুনো জানোয়ারদের কাছাকাছি থেকে কাজ করব।

গবেষণাকেন্দ্র অবশ্য তুলে দেওয়া হয় না, কারণ রঘুরাজের সহকর্মীদের বনে বনে ঘুরে কাজ করার ঝোঁক ছিল না। কাজেই গবেষণাকেন্দ্রটি থেকেই যায়। একমাত্র রঘুরাজ চলে যায় গবেষণাকেন্দ্র ছেড়ে।

গবেষণাকেন্দ্র ছেড়ে সে যে কোথায় গেল কেউ জানে না।

রঘুরাজ নিরুদ্দেশ হওয়ার দু'বছর বাদে মধ্যপ্রদেশে একটি বনের মধ্যে একজন বিদেশী শিকারী রাইফেলের গুলি খেয়ে মারা পড়লেন। সেই বনের কাছে তখন "গোঁড়" নামক আদিবাসীদের ছোট একটি গ্রামে ক্যাম্প করেছিলাম আমি। আমার সঙ্গে ছিল সুরজিৎ। গ্রামের মুখিয়া আমাদের খবরটা দিয়ে বললে, বোধ হয় অন্য কোনও শিকারীর গুলি খেয়ে ঐ সাহেব শিকারীটা মারা পড়েছে। সাহেবের মত ঐ শিকারীও হয়তো নীলগাইটাকে মারতে যাচ্ছিলেন—তাঁর গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সাহেবের গায়ে এসে লেগেছে। এখানকার বনের সেপাইরা খুঁজে বেড়াচ্ছে এই শিকারীকে।

এই অনুসন্ধান পর্বে ফরেস্ট গার্ডদের সঙ্গে হাত মেলায় শ্যাডোলের আর্মড্ পুলিশ। সমস্ত বন চষে ফেলে শেষ পর্যন্ত যাকে তারা ধরে ফেলে সে হচ্ছে রঘুরাজ রাঠোর।

রঘুরাজকে ধরে বেঁধে আমার ক্যাম্পের সামনে দিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ ও ফরেস্ট গার্ডের দল। আমরা আমাদের তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়াতেই সে সুরজিতের দিকে তাকিয়ে মৃদুমন্দ হাসে।

রঘুরাজের দিকে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে সুরজিৎ বললে, আপনিই তাহলে সেই শিকারী! নিমেষে গম্ভীর হয়ে ওঠে রঘুরাজের মুখ। সে বললে, হ্যাঁ। কিন্তু আমি শিকারীদের শিকার করি, বনের জানোয়ারদের নয়।

সুরজিৎ বললে, তার মানে আপনি ঐ সাহেবকে—

—হ্যাঁ, ঐ সাহেব যখন বুনো শুয়োরটাকে গুলি করে মারতে যাচ্ছিল, তখন আমিই তাকে মেরেছি। এরা ভাবছে আমাকে ধরে বেঁধে রাখলেই বুঝি শিকারীরা

নিরাপদ হবে। কিন্তু আমাকে ধরলেও বনের মানুষরা আছে। বনের পশুদের সত্যিই তারা তাদের আপনজন বলে মনে করে। তাদের বাঁচাবার জন্য তারা তাদের জীবন দিতেও প্রস্তুত। মধ্য ভারতের এই বন শুধু নয়, এ দেশের সব বনের মানুষদের মধ্যে এই চেতনা জেগেছে যে, বনের মানুষদের স্বার্থে বনের পশুদের বাঁচাতেই হবে।

সুরজিৎ অবাক হয়ে রঘুরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনি কী বনে বনে ঘুরে এই কথাটা প্রচার করেছেন ওদের মধ্যে ?

—প্রচার কাকে বলছেন গুহ সাহেব ! রঘুরাজ উত্তেজিত স্বরে বললে, বনের মানুষরা নিজেরাই বুঝেছে।

রঘুরাজ বনের বাসিন্দাদের মধ্যে যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা পরে বুঝতে পেরেছিলাম। বনের মধ্যে বন্যদের বেঁচে থাকার অধিকার এখন স্বীকৃত। বন্যপ্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস এখন দেশের সর্বত্র দেখতে পাই।

॥ সমাপ্ত ॥